কিশোর গ্রন্থাবলী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মহালয়া
১৩৬৭

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

প্রস্তুন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

সূচী ঃ

উপন্যাস ঃ

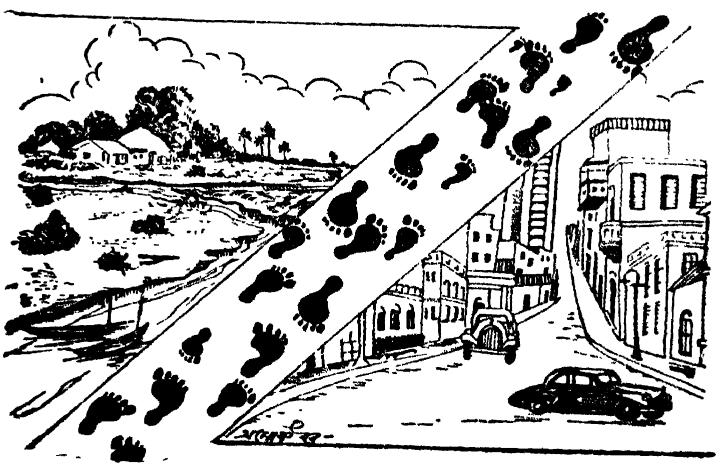
সে এক পথিক ১

নাটক ঃ

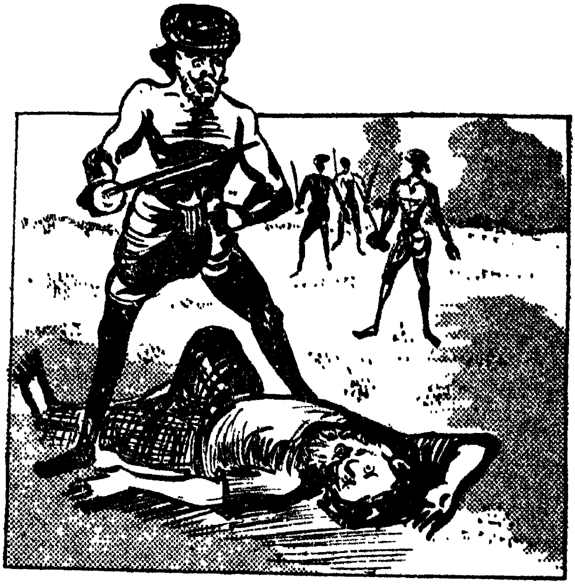
জন্মদিন ৫৯

গল্প ঃ

খোঁড়া ফকিরের চরিত-কথা ৭৯
আষাঢ়ে কাহিনী ৮৭
বিপিনবিহারীর চোর ধরা ৯৪
শঙ্খিনীর পাক ১০২
ছেলেটা ১০৮
প্যাংা ও পটকা ১১৫



উপন্যাস



সে এক পথিক

এক

নাম তার বাসব।

কিন্তু চেহারাটি ছিল কালো, লম্বা, রোগা; নাকটা ছিল উঁচু। তবে চোখ দু'টি ছিল কিছু ডাগর। তাতে ছিল কেমন একটু বন্য আলো। মাথার লম্বা উস্কো-খুস্কো চুলগুলোর সঙ্গে দৃষ্টিটা মানিয়েছিল বেশ।

যেদিনকার কথা থেকে আমার এই গল্প শুরু সেদিন সে আসছিল পদ্মার ওপার থেকে পাকশির পোল পার হয়ে হেঁটে নয়, রেলে। সঙ্গে একটি পোঁটলা, পরনে আধময়লা মোটা কাপড়, গায়ে আধময়লা ছিটের শার্ট। হাতে বা বুকে বোতাম নেই—একটি বড় সেফটিপিন দিয়ে বুকটা আঁটা। তাতে কলারটা বিশ্রী রকমে হাঁ হয়ে মফঃস্বল-শহুরে ফ্যাসানটা বজায় রেখেছিল। পা দু'খানা ছিল খালি। অবশ্য কি শীত, কি গ্রীষ্ম জুতোর চর্মবন্ধন থেকে সে দুটি মুক্ত থাকে।

আশ্বিন তখন শেষ হয়ে আসছে কিন্তু পুজো শেষ হয় নি। বাইরে পড়ন্ত রোদের সোনালি রঙ্ মাখা সজল সবুজ চলন্ত দৃশ্য, আকাশে সোনালি পাড় দেওয়া কালো-সাদা মেঘভার। পাশে বেঞ্চিতে পোঁটলায় খানকয়েক

নতুন কাপড়, কয়েকটি নতুন জামা, মনে কয়েকটি গুরুতর চিন্তা আর ট্যাঁকে গুটি কতক টাকা।

বাসব বসে আছে জানলার ধারেই। চোখ দেখছে, মন ভাবছে। অন্য যাত্রীরা গল্প করছে, বিড়ি টানছে।

তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে দেখে বয়স্কদের মধ্যে দু'-একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "খোকা, কোন্ ইষ্টিশনে নামবে ?"

বাসব উত্তর দিয়েছিল একটু অনিচ্ছায়। লোকগুলোর চাহনি, চেহারা ও জিজ্ঞাসার ধরণ এমন ভারিক্কি ও রুক্ষ যে বিরক্তি ধরে।

বাসব ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখলে টাকা কয়টি রয়েছে ঠিকই ; আর পোঁটলার ওপর রয়েছে তার একখানি হাত। দুটি জিনিষই তার দিদির দেওয়া। দিদি বার বার সাবধান করে দিয়েছে, "হারাস্ নি! কত কষ্টের জিনিষ। গেলে বছরকার দিনে—"

কেউ তাকে বিশ্বাস করে না! সে কি সব ভাঙতে, ছিঁড়তে, হারাতেই আছে ? অথচ সে না হলে কিছুই তো হয় না! বাবা মারা যাবার পর থেকে তার ওপরেই সব ভার। তবুও বড়রা ভরসা পায় না। তবে ছোট ভাই-বোন ক'টি, তারা মানে বটে !

জামা-কাপড় ক'খানি তার ও ছোট ভাই-বোনদের। ভাগে প্রত্যেকের মাথা পিছু পড়বে একখানি করে। বাসবের ট্যাঁকের টাকা ক'টি দিতে হবে মায়ের হাতে—পূজোর খরচ। প্রাণিকুলের জঠরে যে জাগ্রত দেবতাটি রয়েছেন তাঁরই পূজোর, অন্য কোন দেবতার নয়।

দিদির অসুখ। ভাল থাকলে তাকেও দু-এক টাকা দিত। দিদির ব্যথাকাতর ম্লান চোখ দুটি ও দুর্বল কণ্ঠস্বর তাকে পীড়া দিচ্ছিল। ওদিকে সে পাঁচ দিন ঘরছাড়া ও খেলার মাঠে অনুপস্থিত। তাই মনটা এক একবার ছুটছিল পদ্মার ওপার, এক একবার ঘুরপাক দিয়ে আসছিল বাড়ি ও বন্ধুমহলে। এরই ফাঁকে ফাঁকে জঠর-মন্দির থেকে রব উঠছিল "মৈ ভুঁখা হুঁ।" সে গাড়িতে উঠেছে বেলা দশটায় আর এখন বেলা বাজে সাড়ে ছ'টা। সামনেই জংশন! ওখানে এই গাড়ি থেকে নেমে উঠতে হবে আর এক গাড়িতে। সেখানা যাবে গোয়ালন্দর লাইনে। জংশন থেকে তাকে যেতে হবে মাত্র আট মাইল। কিন্তু জংশনে গাড়িখানা পাবে তো ?

একটু আগেই সকলে বলাবলি করছিল, "পূবের গাড়ি হয়তো পাওয়া যাবে না।"

তা হলেই মুস্কিল। পরের গাড়ি আসবে রাত বারোটায়। ততক্ষণ…

বাসব অস্থির হয়ে পড়লো। মন চলে তো গাড়ি চলে না। গাড়ি যদি বা চলতে চায়, সিগনাল দেওয়া হয় না। তাই জংশনের আগে, কেবিনেরও আগে দূর সিগনালের ধারে গাড়ি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চীৎকার করতে লাগলো।

দু'পাশে ভিজে জঙ্গল, বড় বড় গাছ, রেলের প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—শালুক ও কলমী ভরা। গাড়ির চীৎকারটা তাতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। যারা পূবে যাবে তারা ব্যস্ত হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলো। ওই দূরে স্টেশন…গাড়িখানা আছে কি? একজন নিঃসংশয় চিত্তে বললে, "নেই, থাকলে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যেত।"

বাসব বসেছিল উল্টো দিকে। তারও উঠে গিয়ে দেখবার ইচ্ছা একবার মনে উদয় হল বটে কিন্তু তার স্বভাবমতো ভিড় থেকে রইলো দূরেই। সকলে যা করে, তার তা করতে ইচ্ছা যায় না। ওই জানলায় ভিড় করে দেখে কি লাভ? গাড়ি যদি না থাকে তাহলে ওরকম ঠেলাঠেলি করে দেখলেই কি পিছু হটে গাড়ি আবার এসে দাঁড়াবে? থাকলে গিয়ে চড়বো, না থাকলে কি করবো সেটা তখন ভেবে দেখলেই চলবে।

লোকগুলো সরলো না, তেম্নি জানলার গায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাসব তাকিয়ে রইলো গ্রামের দিকে।

হঠাৎ গাড়ি একটা হেঁচকা টান দিয়ে আবার চলতে শুরু করলো; এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে থামলো স্টেশনে।

বাসব পোঁটলাটি হাতে করে গাড়ি থেকে নেমে, ফটকে টিকিটখানি দেখিয়ে অপর দিকের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়িয়ে দু' দিকে তাকিয়ে দেখলো ফাঁকা প্ল্যাটফরম, গাড়ি আধ ঘণ্টা আগে চলে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদেরও কেউ কেউ সেখানে এসে দাঁড়ালেন। বাসব তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। লোকটা তাদেরই শহরের—বাজারের এক দোকানদার। বাসব দু'-একবার তার দোকান থেকে চাল কিনেছে। সেও বাসবকে চেনে।

বললে, "কি করবে গো বাসু? চল ভেতরে গিয়ে বসি গে। রাত বারোটার আগে তো ছাড়ান নেই— !"

বাসব তার কথার কোন জবাব দিলে না, আকাশ ও শূন্য রেলপথটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। মেঘগুলো সব হয়ে উঠেছে আরো কালো, ফাঁক বা ফাটলগুলো গেছে ভরে; সোনালি, স্ফটিক, সবুজ, নীল—যত রঙ ছিল রাতের কালো আঁচলে সব পড়েছে ঢাকা; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সজল বাতাস থেকে থেকে ঝাপ্‌টা মারছে। এখনই নামবে বৃষ্টি, বইবে ঝড়। ওই দূরে একবার মেঘের গুরু গুরু ডাক শোনা গেল।

দোকানী, গোপাল সা, শেডের দিকে যেতে যেতে বললে, "বৃষ্টি আসছে। ভেতরে চলো, বাসু!"

বাসু তবুও গেল না। শেডের নিচটা তখন পূবের যাত্রীতে গিজ গিজ করছে, যেন মাছির ঝাঁক। সে শূন্য রেলপথটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। উঁচু বাঁধ, নিচে দু'পাশে জলা, মাঝে মাঝে জলে ডোবা ক্ষেত, ভিজে বনজঙ্গল। কাছে গ্রাম বা বসতি নেই। এখন সব অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আর সেই অন্ধকারের গায়ে উড়ছে জোনাকি।

বাসব পোঁটলাটি হাতে করে সেই পথের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো। এই পথটির সঙ্গে তার বার দুই পরিচয় ঘটেছিল। মাঝে দুটি খোলা পোল আছে। তার কাঠগুলি ফাঁক ফাঁক করে পাতা। সাবধানে না চললে, ওপর থেকে অন্ততঃ ত্রিশ ফুট নিচে খরস্রোতা স্রোতস্বতীটিতে গিয়ে পড়তে হবে। তার ধারাটি অগভীর, বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে হুঙ্কারে ছুটে চলেছে। আবার পোল পার হবার সময় কোন গাড়ি এসে পড়লে পাশে সরে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও নেই। জনমানবহীন, ভিজে খোয়াঢালা এই অন্ধকার কঠিন পথ! পাশে কুশ ঘাসের বন—সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুরের আড্ডা। রাতে তারা সকলেই শিকারে বেরিয়েছে।

এই পথের আট মাইল—তার খুব বেশি যদি লাগে তো দু' ঘণ্টা। একে জয় করায় আনন্দ!

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সে মালকোঁচা মেরে পোঁটলাটি মাথায় করে চললো সেই পথের দিকেই। তার বন্য চোখ দুটো হয়ে উঠলো আরো বন্য, তীক্ষ্ণ।

দুই

বাসব চললো জলে ধুয়ে আরো তীক্ষ্ণ খোয়াগুলোর ওপর দিয়ে। খালি পায়ে চলে চলে তার পা দু'খানার চামড়া হয়েছে পুরু ও ঘাতসহ। তাই যতটা লাগবার কথা ততটা লাগলো না, কিন্তু মাঝে মাঝে পা মচ্‌কে যেতে লাগলো।

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হঠাৎ ঘন হয়ে অবিরাম ধারায় পড়তে শুরু করলো; বাতাস হয়ে উঠলো দুরন্ত, দুর্বার। আর পথের দু'পাশে কুশের বনে, জলার বুকে ফিস-ফিসানি, ছল-ছলানিকে মনে হতে লাগলো কারা যেন কথা কইছে।

সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দূরে সিগনালের আলোটা লাল চোখটি মেলে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে, যেন একটি নক্ষত্র। সে আন্দাজ করে নিলে স্টেশন থেকে এসেছে আধ মাইলটাক পথ। এখনও সাড়ে সাত মাইল বাকি। মাঝে রয়েছে আর একটি স্টেশন।

পথ চলবার শুরুতে তার যতখানি ভয় হয়েছিল, এখন সে ভাবটা গেল কতকটা কমে। মনে হতে লাগলো, অন্ধকারকে সকলে মিথ্যে ভয় করে। এই তো সে বেশ দেখতে পাচ্ছে। তবে সব অস্পষ্ট। শরতের মেঘ যেমন আড়ম্বর করে আকাশখানা ঢেকে ফেলেছিল এবং যে ভাবে গর্জন ' বর্ষণ শুরু করেছিল তার শেষ করলে নিতান্ত দুর্বলের, অক্ষমের মতো। মেঘের কালো কপাট দু'খানা হঠাৎ খুলে তারাগুলো বেরিয়ে এল ঝিক্‌মিক্ করে। জলার কোথায় যেন একটা রাতের পাখি সঙ্গীকে অদ্ভুত শব্দে ডাকলে। ব্যাঙগুলো নানা স্বরে চীৎকার করছে। ঝিঁঝিঁর চীৎকারের বিরাম নেই। অন্ধকার কুশের বনে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল মানিকের মতো পড়ে আছে এক ধরনের পোকা। বাসবের দৃশ্যটি লাগলো ভালই।

চলতে চলতে তার হঠাৎ কানে এল, ঝর ঝর শব্দ। শব্দটি পোলের নিচ দিয়ে এক জলা থেকে আর এক জলায় জল ছুটে যাবার। ওইখানে আছে বড় বড় পাথর। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে উঠছে ফেনা।

বাসব সাবধানে পোলটির ওপর দিয়ে পারে পৌঁছতেই দেখতে পেল, সামনে অন্ধকারে তিনটি আলো ঝিক্ ঝিক্ করছে। একটি হুইস্‌লও কানে এল। সে জানতো এ সময়ে মালগাড়ি ছাড়া কোন যাত্রিগাড়ি নেই। সে যে ঠিক সময়ে পোলটি পার হয়েছে এ জন্যে তার আনন্দ বোধ হল। পোল

পার হবার সময় গাড়িখানা এসে পড়লে যে বিপদ উপস্থিত হত, তা থেকে নিস্তার পাওয়া ছিল অসম্ভব।

সে লাইন ছেড়ে পাশের সরু পায়ে-চলা পথটিতে নামলো।

বাসবের অনুমানই ঠিক। একখানা মালগাড়ি ছুটে আসছিল। তার চোঙ থেকে আগুনের ফুল্‌কি উড়ছে। চুল্লির ঢাকনাটা খুলে বোধহয় ফায়ারম্যান চামচ চামচ কয়লা দিতে লাগলো। তাই পথের পাশে লাল আলো পড়ে কুশবনের ওপর দিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। গাড়িখানা পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

বাসব আবার উঠলো লাইনের ওপর। এবং চলতে লাগলো সাবধানে। সামনে আর একটি পোল। তবে সেটি ছোট। প্রায় সেখান থেকেই লাইনের দু' পাশে গ্রাম। তারপর সেই স্টেশনটি।

কিছুদূর যাবার পর দুটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তারাও আসছিল লাইনের ওপর দিয়ে গল্প করতে করতে। বাসব শুনেছিল, এই দিকেই কোথায় একবার ডাকাতি হয়। তাতে একটা লোক খুন হয়েছিল। সে শুনেছে, সাঁওতাল পরগণায় কয়েক আনা পয়সা ও একখানি কাপড়ের জন্যেও মানুষকে খুন করেছে!

কেন এমন হয়? অর্থের অভাব? তাই-ই হয়তো হবে। সে যতগুলো চোর দেখেছে, তারা সকলেই গরিব। কিন্তু পয়সাওয়ালারা কি চোর, জোচ্চোর, ডাকাত হয় না? তবে বড় বড় দোকানদারদের লোকে চোর বলে কেন? ওদের তো অভাব নেই, তবে?

যে পথিক দু'টি আসছিল, তারা পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাসবের দিকে গ্রাম্য কৌতূহলে তাকালে কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললে না।

তারা চলে গেলেও বাসব যেতে যেতে বার কয়েক পিছন ফিরে দেখলে। লোক দু'টিকে অন্ধকার গিলে ফেলেছে। কিছুই দেখা যায় না। সে হাল্‌কা মনে চলতে লাগলো এবং দ্বিতীয় পোলটা সহজেই পার হয়ে গেল।

পথটি সেখান থেকে ঘুরেছে ডান দিকে। সে বাঁকের মোড়ে যেতেই সামনের স্টেশনটির সিগন্যালের আলো দেখতে পেল।

এখান থেকে গ্রামের ভেতর দিয়েও তাদের শহরে যাবার পথ আছে। কিন্তু পথটা একটু জটিল। ভুলে বিপথে পড়লে শহরে না গিয়ে তাকে পৌছতে হবে আর এক গ্রামে।

সে লাইন ধরেই চলতে লাগলো এবং স্টেশনে পৌঁছে তার একটু বিশ্রামের ইচ্ছা হল। কিন্তু চলার বেগ তাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে সে থামলো না, আঁধার নির্জন প্ল্যাটফরম পার হয়ে আবার নামলো লাইনে।

আর মাত্র সাড়ে তিন মাইল। কিন্তু এই পথের প্রায় শেষ দিকে সত্যই আছে একটি ভয়ের জায়গা। সে হচ্ছে, কবরখানা। সাহেবদের সেখানে কবর দেওয়া হয়।

জায়গাটার একদিকে আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউ গাছের সারি। স্তব্ধ নির্জন দুপুরে যখন ঝাউ-শাখার মাঝ দিয়ে বাতাস বয়ে যায় তখন যে সোঁ সোঁ শব্দ-স্রোত জাগে তাকে সময়ে সময়ে মনে হয় প্রেতিনীর করুণ কান্না। ওই জায়গাটার সম্বন্ধে সে নানা গল্প শুনেছে। শুনতে শুনতে ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এই ভরা অন্ধকারে তাকে একা যেতে হবে ওরই পাশ দিয়ে!

এবার সত্যই তার বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। সে জায়গাটার যত কাছে যায়, বুকের কাঁপন ততই বাড়ে। এবং শেষে সে যখন জায়গাটার একেবারে পাশে গিয়ে পৌঁছলো তখন মনের অবস্থা এমন হল যে সে বুঝতেই পারলে না, সে হেঁটে না উড়ে যাচ্ছে! তার দম যেন বন্ধ হয়ে গেছে। জায়গাটা পার হতে হতেই তার মন হয়ে উঠলো দৃঢ়। কৈ, কিছু তো হল না! মিথ্যা ভয়!

সেখান থেকে একটি পথ রেললাইনকে কেটে দু'দিকে চলে গেছে। সে গুমটি পেরিয়ে শহরের পথ ধরে বাড়ি এসে পৌঁছলো।

মা ঘর থেকে অন্ধকার উঠোনে এক ছায়ামূর্তি দেখে চমকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

"আমি।"

"বাসু?"

"হাঁ।"

তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলেন।

"একি চেহারা? কোন্ গাড়িতে এলি?"

"হেঁটে—" বল্‌তে বল্‌তে বাসু মাথার পোঁটলাটা বারান্দায় ফেলে গম্ভীর মুখে ঘরে উঠে গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে খেতে বসে পথের কাহিনীটি বর্ণনা করল।

মা বললেন, "ধন্যি সাহস!"

বাসু একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। ভাই-বোনেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেও তাদের পাশে মলিন শয্যায় ক্লান্ত দেহটা ছড়িয়ে দিল।

তিন

তার ঘুম ভাঙলো ঢাকের আওয়াজে। ঘরের পাশে ছিল একটা বুড়ো শিউলি গাছ। তার শিশির-ভেজা ফুলগুলোর গন্ধ সকালবেলার ভিজে বাতাসে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে ঘরে এসে তারও নাকে লাগলো। জানলার ফাঁক দিয়ে সোনালি আলো এসে যেন তার চোখে কোমল আলো বুলিয়ে ডাকছিল: 'জাগরে, আমি এসেছি।...'

তার কানে বাইরে থেকে জল ঢালার ছল ছল শব্দ। মা খুব ভোরে ওঠেন। বাড়ি-ঘর ঝাঁট দিয়ে, নিকিয়ে, কাপড়-চোপড় কেচে, রান্না ঘরে গিয়ে কাঠের উনুনটি জেলে তাদের ক'জনের জন্য ফেন-ভাত রান্না করেন। মা বোধহয় ভাতের হাঁড়িতে জল ঢালছেন।

সে পাশ ফিরে দেখলো, বোনটি নেই, ভাই দুটি ঘুমোচ্ছে। অন্যদিন তারাই আগে ওঠে, সে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আজ সে উঠলো তাদের আগে, তবে বোনটি ওঠে মায়ের সঙ্গে। সে ফুল তোলে, মায়ের কাজে সাহায্য করে। বয়েস মোটে দশ বছর। কিন্তু কত কাজ জানে। মা বলেন, "ভাগ্যে আমার মাধু ছিল! মেয়ে থাকা কত লাভের!"

আবার এই মাধুর জন্যেই তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কখন কখন বলেন, "মেয়ে না হয়ে ও যদি ছেলে হোত!" বড়দের কথায় মিল থাকে না কেন? তার এ প্রশ্নের পরোক্ষে উত্তর দেন, সামনের বাড়ির অশ্বিনীবাবু। তাঁর অবাধ্য ছেলেটাকে শাসন করতে করতে ও উপদেশ দিতে দিতে বলেন, "বড় হও, সংসারে ঢোক, তখন বুঝবে কেন আমরা এক এক সময়ে উল্টো-পাল্টা কথা বলি!"

বাসব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তার আজ অনেক কাজ—বারোয়ারি-তলায় যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, ভাসানের বাচখেলার জন্যে নৌকো ঠিক করা। খেলার মাঠে হাজিরা দেওয়া, পড়া-শুনো? যেদিন স্কুল বন্ধ হয়েছে, বইগুলো বন্ধ হয়েছে তার আগের দিন থেকে, খোলা হবে ইস্কুল

খোলার কয়েকটা দিন আগে। বাড়ির কাজ আর ইস্কুলের পড়া এ দুটো এমন নীরস ও ভারী লাগে কেন তা সে বুঝতে পারে না। মানুষের কাজ কি কেবল ঘর-সংসার ও ইস্কুল-কলেজের পড়া আর বড় হয়ে চাকরি-বাকরি করা?

তাদের পাড়ায় একটি সেবা-কেন্দ্র (মিশন) আছে। তার কর্মীরা মুষ্টি-ভিক্ষা করে, লোকের রোগে সেবা-শুশ্রূষা করে থাকে। কারো বাড়িতে আগুন লাগলে, দা-কুড়ুল ও বালতি নিয়ে সেখানে ছুটে যায়। বাসব এই সেবা-কেন্দ্রের এক অস্থায়ী কিশোর-কর্মী। কিন্তু এই কেন্দ্রটিকে ভাল চোখে দেখে না এমন লোকও আছে।

আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক্ তারা সকলে খারাপ। তাহলে ভাল যারা তারা এসব কাজে এগিয়ে আসে না কেন? এই কাজগুলোও কি খারাপ? খারাপ লোকে ভাল কাজ করলেও সেই কাজগুলোও কি খারাপ হয়ে যায়?

কখন কখন তার মনে একটা অদ্ভুত কল্পনার উদয় হয়। সে ভাবে, এমন যদি হয় যে দেশে ভিখারী থাকবে না, যারই অসুখ হোক না হাসপাতালে বিনা পয়সায় হবে তার চিকিৎসা। মুষ্টি-ভিক্ষা বেচে ও চাঁদা তুলে গরিব ছাত্রদের যে পড়ার খরচ দেওয়া হয়, তাও আর দিতে হবে না, তাহলে তো এই সেবা-কেন্দ্রের দরকার থাকবে না। কিন্তু এই বকাটে ছেলেগুলো যাবে কোথায়? ওরা কি আরও বকামি করে বেড়াবে? অবশ্য, অবস্থা যখন বদলাবে, ওরাও যাবে বদলে। মানুষ তখন কেবল নিজের কথাই ভাববে না, পরের কথাও ভাববে।

সে চোখ-মুখ ধুয়ে বাড়ির বার হতে যেতেই তার মা বললেন, "উঠেই চললি? বাজারে যেতে হবে যে!"

"এখনই আসছি" বলে সে আর দাঁড়ালো না বারোয়ারিতলার দিকে চললো।

বারোয়ারিতলাটা ছিল রেল লাইনের ধারে, প্রায় বাজারের কাছে। একখানা মাঠে খাটানো হয়েছে প্রকাণ্ড সামিয়ানা। তার একধারে ঝুলছে একখানা ভাঙা চিক। মেয়েরা বসবে ওর আড়ালে। প্রতি বছরই এই ব্যবস্থা হয়। প্রতিমা থাকে বড় ছাপড়ের তলায়, তার সামনে বেঁধে দেওয়া হয় দুটো মোটা বাঁশ আড় করে—উদ্দেশ্য দর্শকদের ভিড় যাতে প্রতিমার ওপর এসে না পড়ে।

সে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, পথে দেখা হলো অমৃতর সঙ্গে। অমৃত তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। সে বললে, "কি রে! তুই না পুজোটা এবার বাইরে করবি বলেছিলি?"

বাসব বললে, "তুইও তো বাড়ি যাবি বলেছিলি!"

"আমি আজই যাবো। তুই তো আর যাবি না?"

"না।"

"তবে চল আমাদের গ্রামে।"

বাসবের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাধা ছিল। সে একবার অমৃতদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। তাদের এই মফঃস্বল শহর থেকে গ্রামখানা তিনক্রোশ তফাতে। যেতে হয় গরুর গাড়িতে। কিন্তু বাসবরা গিয়েছিল সাইকেলে। পথের দু'পাশে ক্ষেত-খামার, জায়গায় জায়গায় জঙ্গল, পুরণো বট-পাকুড় ও আম-কাঁঠালের গাছ। শীতকালে সে অঞ্চলে কখন কখন চিতা-বাঘের উৎপাত হয়। কিন্তু বুনোশূয়রের দৌরাত্ম্য বারমাস। বাসব গিয়েছিল বছর দুই আগে। সেও এই পুজোর সময়ে। তখন তার বাবা বেঁচে ছিলেন। দিনগুলো কেটেছিল বড় আনন্দে।

অমৃতরা শহরে এসেছে। বছর তিনেক হলো। প্রথমে একা ছিলেন তার বাবা, বিহারীবাবু। তিনি উকিলের মুহুরি। থাকতেন উকিলবাবুর বাড়িতে। বছর দেড়েক হলো, পোড়োভিটেটার ওই কোণটাতে দু'খানা খড়ের ঘর তুলে অমৃতদের সকলকে এনেছেন। অমৃত পড়ে তারই সঙ্গে। ছেলেটা পড়াশুনোয় ভাল, আর তর্ক করতে পারে খুব। ওকে বাসবের ভাল লাগে, বড় ছেলেরা অমৃতকে বেশ খাতির করে।

অমৃতর সঙ্গে বাসবের যেদিন প্রথম আলাপ হয় সেদিনকার কথা বাসবের পরিষ্কার মনে পড়ে। শান্ত শিষ্ট ছেলেটি, ক্লাসের প্রায় শেষ দিকে ছিল বসে। তার গায়ে ছিল একটা ছিটের পুরনো সার্ট। পরনে আধ ময়লা মোটা ধুতি, পায়ে ফিতে বাঁধা তালি দেওয়া পেটেণ্ট চামড়ার জুতো, মাথার চুলগুলো সমান করে আঁচড়ানো। সবই সাধারণ পাড়াগেঁয়ে। কেবল কপাল, মুখ ও চোখ দুটির মধ্যে এমন একটি কিছু ছিল যা মনকে আকর্ষণ করে। বাসব কিছুতেই ওর দিক থেকে চোখ ফিরাতে পারছিল না।

ক্লাসের জনকয়েক ছেলে পাড়াগেঁয়ে বলে তাকে এমন ঠাট্টা জুড়ে

দিয়েছিল, তাকে ঠকাবার এমন সব উপায় বার করেছিল যে, বাসব কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে নি।

বাসব তার পক্ষ নিয়ে সকলের সঙ্গে বিবাদ করেছিল, কয়েকজনের সঙ্গে তার হাতাহাতিও হয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে অমৃতকে নিষ্কৃতি দিলেও ভেতরে ভেতরে তাকে জব্দ করবার ফন্দি আঁটতে থাকে। সেই সঙ্গে বাসবকেও একহাত দেখে নেবার মতলব করে। সেই থেকে তারা দু'জনে হয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া অমৃতরা তারই মতো গরিব। তবে দেশে ওদের কিছু জোত-জমা আছে। বাসবদের এই ছোট্ট শহরের এককোণে বাড়িখানি ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বাসব কতকটা রহস্যভরে, কতকটা নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য উত্তরে বললে, "কি হবে গ্রামে গিয়ে? সেখানে কি আছে?"

অমৃত তার মনের কথাটি বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেল। তার মনে হলো বাসব যেন হঠাৎ বদলে গেছে। বললে, "আমাদের দেশের প্রায় পনেরো আনা লোকই যে গ্রামবাসী।"

বাসব বললে, "তার মানে কি শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি আনন্দ?"

"নয়ই বা কেন? আমি তো শহরে থাকি। তবু মনে হয়, সেখানে এখানকার চেয়ে বেশি আনন্দ।"

"সেটা তোমার দেশ বলে।"

"তাই যদি হয়, এই শহরটাও তো তোমার দেশ। সেই জন্যেই একে গ্রামের চেয়ে তোমার ভাল লাগে বেশি। এ নয় যে, গ্রামে কিচ্ছু নেই, সেইজন্য ভাল লাগে না।"

"সেই যদি হয়, এমন অনেক লোকও আছে, যারা শহরে কিছুদিন বাস করবার পর আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। এখানেই ঘর-বাড়ি তুলে বাস করে; গ্রামের কথা একেবারে ভুলে যায়।"

"সে কথা স্বীকার করলেও একথা মানি না যে গ্রামে কিছু নেই, গ্রামে নিরানন্দ।"

"না হলেও তোমাদের গ্রামে এমন কিচ্ছু নেই যার টানে এখানকার আমোদ ফেলে সেখানে যেতে হবে।"

অমৃত তার কথার উত্তর দিলে না, কেবল তার মুখের দিকে একবার তাকালো। তার দৃষ্টিতে কেমন যেন বেদনা।

বাসব সেটুকু লক্ষ্য করে কেমন যেন আমোদ পেল।

সে আর এগোলো না। বাড়ি ফিরে চললো; চললো একটা বস্তির মধ্য দিয়ে। বস্তিটাতে নিম্ন শ্রেণীর বাস, তারা নানা রকমের কাজে জীবিকার্জন করে। বস্তি ছাড়লেই নদী—ওপারে চর জেগে উঠেছে।

বস্তির প্রায় সকলেই তার পরিচিত, কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তার মিতালীও আছে। এদের কারো কারো সঙ্গে মাছ ধরে, নৌকা বায়, গল্প করে।

সে বস্তির মাঝ দিয়ে চলেছে। তখনও রোদের লালচে রং কাটে নি। ঘাসের বনে, গাছের পাতার আগায় ও ঘরের চালে শিশির ঝিকমিক করছে। শান্ত বাতাসে জড়িয়ে আছে পাতলা ধোঁয়া।

চার

নোংরা পথ, বস্তিটার মাঝখানে ছিল একটা পুরোনো পুকুর বা ডোবা। মেয়েরা তার কূলে বাসন মাজছিল—পেতলের, এনামেলের সামান্য থালা-গেলাস—পুরুষেরা কেউ কেউ দাঁতন করে সেই জলে মুখ ধুচ্ছিল, কেউ বা গাড়ুতে জল ভরে নিচ্ছিল। এদের কাছে জলের ভাল-মন্দ বিচার নেই—জল হলেই হল। সমস্ত জায়গাটায় কেমন একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে থাকে।

এই পাড়াটারই দক্ষিণদিকে বাগানটার কোণে থাকেন মাণিকদা। বাড়িতে বুড়ো মা আর ছোট ভাই। মাণিকদা কাজ করেন কলকাতায়, মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়িতে আসেন। এবার এসেছেন কিনা বাসব জানে না।

উনি বলেন, "এই যে সব নোংরামি দেখ, এর মূলেও হল দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য শিক্ষার বা অর্থের। ওই দুটোকে দূর করে দাও, দেখবে এসব কিছুই থাকবে না।"

বাসব জিজ্ঞেস করেছিল, "তাই যদি হয় তাহলে লোকে এই দারিদ্র্য দূর করে না কেন?"

এই প্রশ্নটার উত্তর বাসব ভাল করে পায় নি বা বুঝতে পারে নি। মাণিকদা যতখানি বলেছিলেন, ততখানির মধ্যে সে এইটুকু বুঝেছিল, এখন যে ভাবে সমাজ-ব্যবস্থা আছে সেভাবে যতদিন থাকবে ততদিন এ দারিদ্র্য দূর হবে না। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থা করবে কারা?

মাণিকদা বলেন, "যারা দরিদ্র তারাই।"

কথাটা বাসব বুঝতে পারে না। মনে হয়, তার প্রশ্নটা যেন একই জায়গায় ঘুরপাক দিচ্ছে। ওঁর কাছে বসলে কেবল এইসব কথা শোনা যায়। পৃথিবীতে কোন্ দেশ শিক্ষায় কতখানি এগিয়ে গেছে, কোন্ দেশের টাকা-পয়সা বেশি, কোন্ দেশ স্বাধীনতার জন্য কিভাবে বিদেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, এসব গল্প শুনতে শুনতে তারা মশগুল হয়ে যায়। ওই সঙ্গে শোনে মাণিকদার বাঘ ও কুমীর শিকারের চমকপ্রদ কাহিনী। কিন্তু সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর হচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী।

মাণিকদা বললেন, "সব দেশের নিঃস্বের দলের অবস্থা আমাদেরই মতো। দেখছ না তাই পৃথিবীর কোন দেশে শান্তি নেই?"

যেতে যেতে বাসবের দু' একজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। তারা যাচ্ছিল ছিপ-বঁড়শি নিয়ে ডোবায় মাছ ধরতে। তারাও স্কুলে পড়তো। কিন্তু ষষ্ঠ মান অবধি গিয়ে সেই যে আটকে গিয়েছিল আর এগোতে পারে নি।

ওরা দু'জনই জাতে মুচি। মাস্টার মশায় দু'হাতে ঢোল বাজানোর ইঙ্গিত করে একদিন বলেছিলেন, "যা, বাড়ি গিয়ে জাত ব্যবসা কর গে। এ তোদের কম্ম নয়। তাতেই পেটের ভাত হবে।"

মাস্টার মশায়ের কথা শুনে ক্লাসের আর সকলের সঙ্গে বাসবও হেসে উঠেছিল।

শুনে মাণিকদা বলেছিলেন, "মানুষের প্রাচীন ইতিহাস যদি মানতে হয় তাহলে ওদের ঠাট্টা করার মধ্যে পৌরুষ নেই। গোড়ার দিকে সকলেরই অবস্থা ছিল একসঙ্গে তাল দেওয়া।"

বাসব মাণিকদার এ কথাটা বোঝে না, গোড়ার দিকে মানুষ এমন ছোট বড় ছিল না, না যদি থাকবে তবে এমন ছোট বড় হল কি করে? কে করলে এই ব্যবস্থা?

ডোবাটাতে মাছ আছে নানা রকমের। তবে সবই ছোট জাতের। বাসবের লোভ হল ওদের সঙ্গে বসে যায় মাছ ধরতে।

একজনের নাম নন্দ। সে বললে, "বাসু, বাড়ি থেকে ছিপ নিয়ে আয়। কালকে এক থালুই সরল পুঁটি ধরেছিলাম।"

মাছ ধরবার ইচ্ছা থাকলের মায়ের কথা বাসবের মনে পড়লো। সে

বয়স্কের মতো ঘাড় নেড়ে বললে, "এখন মাছ ধরবার সময় নয়।" এবং ভারিক্কি চালে সে নিজের পথে চলতে লাগলো।

নন্দর সঙ্গে ঐ যে ছেলেটা, ওর নাম মহাদেব। ও-ও পড়তো বাসবের সঙ্গে। কিন্তু কি জানি কেন ও বাসবকে দেখতে পারে না। না ভাল লাগবার একটা কারণ বাসব ধরতে পেরেছে, সেটা হচ্ছে আখড়ায় লকড়ি খেলায় বাসবের মারগুলো। ও কিছুতেই বাসবের লকড়ি ঠেকাতে পারতো না।

ওদের ওস্তাদ হল, বুড়ো বলাই সর্দার। বলাই ছিল মেহের সর্দারের সাকরেদ। আখড়ার সকলে বলাইকে বলে 'ওস্তাদ'। খেলবার আগে কি বামুন কি শূদ্র বলাইয়ের পায়ের ধুলো নেয়।

ওস্তাদ নাকি এক সময় ছিল ডাকাত। তখন লাঠি ভর দিয়ে ঘর ডিঙিয়ে যেতে পারতো, রণ-পায় এক ক্রোশ পথ পার হত পাঁচ মিনিটে। বাসবরা ওস্তাদের কাছে এই কৌশল দুটো দেখাবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে, কিন্তু ওস্তাদ দেখায় নি; বলেছে "বুড়ো হয়েছি, এখন কি ওসব পারি?"

কিন্তু বুড়োই যদি হবে তবে ওর গোঁফের চুল, মাথার চুল একগাছিও পাকে নি কেন? লম্বা-চওড়া শরীর, লোহার কাঠির মতো। আঙুলগুলো, খরখরে, লাল চোখ, ঝকঝকে দাঁত, মোটা দৃঢ় গলার স্বর, সদর্প চলা-ফেরা— এসব কি বুড়ো হবার লক্ষণ? তবুও ওস্তাদ বলে, "বুড়ো হয়েছি বাবা।"

আখড়ায় ছেলে বুড়ো কত লোক লাঠি খেলতো, কুস্তি করতো। কিন্তু আখড়াটা বছর খানেক হল উঠে গেছে। আখড়ার জনকয়েক চাঁইকে পুলিশে একবার নিয়ে গেল। তারপরই ওটা আস্তে আস্তে উঠে গেল। আখড়া বাড়িটা এখন ভেঙ্গে-চুরে, বন-জঙ্গলে ভরে, সাপ-খোপ ও ভূতের বাসা হয়ে আছে। ওই জঙ্গল থেকে মাস কতক আগে বেরিয়েছিল এক জোড়া দাঁড়াস সাপ, লম্বায় হবে আট হাত। সাপ জোড়া বার করেছিল একটা সাপুড়ে। তার মাথায় ছিল পাগড়ি, কানে মাকড়ি, কাপড়-জামার রঙ ছিল গেরুয়া। সে বাঁশি বাজিয়ে সাপ জোড়াকে ভুলিয়ে বন থেকে বার করে এনেছিল।

বস্তির জামতলা ছাড়িয়ে 'ফাঁসির বাগানের' পাশ দিয়ে বাসব গিয়ে পড়লো মাণিকদার বাড়ির সামনে। ফাঁসির বাগানে কয়েকটা লোক গলায় ফাঁসি

দিয়ে মরেছিল। কেন মরেছিল সে সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলে। তবে এক জায়গায় সবারই কথায় মিল আছে। সেটা হচ্ছে—তারা ছিল অসুখী। এবং সকলেই ছিল গরিব। সন্ধ্যাবেলায় বাগানটার পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না। বাগানটা আম, গাব আর কাঁঠালের গাছে ভরা। সেই সঙ্গে আছে দুটো রয়না, আচিন ও পাঁইও গাছ। ভর দুপুরে যখন সব নিঝুম হয়ে আসে, পাখির গান যায় থেমে, বাতাস ফিস্ ফিস্ করে গাছের কানে কানে কথা কয় তখন মনে হয় যারা মরে গেছে তারা যেন সূক্ষ্ম দেহে ওখানে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। গ্রীষ্মকালে বাগানটার গাছে ফল পেকে উঠলেও সেইজন্যে কেউ যেতে সাহস করে না। ওর ফল খায় পাখিতে।

বাসব দেখলে মাণিকদার বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া। পাশের বাড়ির জলধর বললে, "তারা গেছে কলকাতায়।"

জলধরের বাবা ছিল মাণিকদার চাকর। মাণিকদা জলধরকে খানিকটা জায়গা দিয়েছে। জলধর সেখানে একখানা খড়ের ঘর বেঁধে বউ নিয়ে আছে। জলধর বাজারে একটা চালের দোকানে চাকরি করে।

বাসব জিজ্ঞাসা করলে, "মাণিকদা আসবে না?"

—"না।"

তার উত্তর দেবার ধরণে বাসবের আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না।

সে বাড়ি ফিরে এল।

মা বললেন, "সেই বেলা করলি!"

—"কৈ বেলা? এখনও সাড়ে আটটার গাড়িখানা যায় নি।" যাদের ঘড়ি নেই গাড়িখানা তাদের ঘড়ির কাজ করে।

—"নে বোস—বোসে যা—"

ভাই-বোনেরা ফেনে ভাতে খেতে বসেছিল—সঙ্গে নুন, কাঁচা লঙ্কা ও কয়েকটা আলুভাতে।"

মা কাপড়ের খুঁট থেকে একটি সিকি ও একটি দুয়ানি বার করে কি কি আনতে হবে তার মৌখিক ফর্দ দিলেন।

ফর্দ শুনে বাসব চমকে উঠলো; বললে, "ছ' আনায় এত? কি করে হবে? জিনিসপত্তরের দাম কি রকম বেড়েছে তা তো জান না!"

—"কেন বাড়বে?"

—"কেন বাড়বে? জান না যুদ্ধ হচ্ছে?"

—"কোন্ দেশে যুদ্ধ হচ্ছে তার ঠিক নেই, এ দেশে—"

—"নাঃ! তুমি বুঝবে না কিছুতেই—"

—"বুঝে কি হবে? যুদ্ধ হচ্ছে বলে তরিতরকারি, লঙ্কা, হলুদ, মাছ, সুপুরি—"

—"তোমার সঙ্গে তর্কে কেউ পারবে না।"

—"তর্কের দরকার নেই, যা আনতে বলছি এনে দে—"

—"আমি আগেই বলে দিচ্ছি এত সব আনা হবে না। তুমি তো জান না জিনিসের দাম কম বললে দোকানদারগুলো মারতে আসে; কেউ কেউ হাসে—"

—"তোর বেলাতেই হাসে! কৈ, আর কারো বাড়িতে তো—"

—"এ পাড়ায় আমাদের চেয়ে গরীব কে? তারা দরকার মতো খরচ করতে পারে তাই এমন হয় না।"

মা এবার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নিঃশ্বাসটি ছোট, কিন্তু বাসবের বুকে তা বাজলো। সে আর বাক্য ব্যয় না করে থলি, থালুই ও পয়সা ক' আনা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চলতে চলতে তার মনে পড়লো একটি ঘটনা।

পাঁচ

সেটাকে বলা যেতে পারে একটি গল্প। শুনেছিল সর্দারের বাড়িতে।

বাসব পাড়া ছাড়িয়ে নদীর পাড় ধরে চলেছিল। নদীটার ওপারে নতুন চর পড়েছে তাতে বন-ঝাউয়ের চারাগুলো উঠছে গজিয়ে, ঘোলা জল হয়ে এসেছে কাঁচের মতো নির্মল। ওপারে জলের কূলে বসেছে বক, কাদা-খোঁচা এপারে পুচ্ছ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চঞ্চল খঞ্জন।

এই নদীর ওপারে বাঁয়ে ওই দেখা যায় ধোঁয়ার মতো গাঁ নীলপুর ওর ওধারে আছে বগাসাড়ি। ওস্তাদের বাড়ি হল সেই বগাসাড়ি গাঁয়ে একটা বড় পুকুরের ধারে। পুকুরটা অনেক কালের। তার এক দিকে আছে ঘন বনজঙ্গলে কাঁটাগাছে ঢাকা একটা মস্ত ঢিপি, আর একদিকে একটা বুড়ো বট জটেশ্বরের মতো জটা ঝুলিয়ে আছে দাঁড়িয়ে। গাছটার তলায় আছে

বেদী। তার সামনে একটা হাড়কাঠ। হাড়কাঠটা ক্ষয়ে, হয়ে গেছে সরু ও ছোট। তার একটা ডাল গেছে ভেঙে আর একটা ডাল গেছে লম্বালম্বি ফেটে। সেবার শীতকালে বড়দিনের ছুটিতে বাসবরা ক' বন্ধু মিলে গিয়েছিল ওস্তাদের বাড়ি। তখন সব দেখে এসেছে।

ওস্তাদ বলে, "ওই ঢিপিটা ছিল এক জমিদারের বাড়ি। সে ছিল বিদেশী। নানা কৌশলে হয়ে বসেছিল জমিদার, লোকটার ছিল অনেক টাকা। তার দলে ছিল বড় বড় লেঠেল। সে তাদের নিয়ে ডাকাতি করে বেড়াতো। লোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে-কুড়ে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে খুন করে সোনা-রূপো-টাকার বস্তা আনতো ঘরে। কিন্তু লোকে টের পেতো না। তারা তাই জমিদারটার কাছে ডাকাতদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতো, তাদেরকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে বলতো।

"কিন্তু গ্রামের একটা লোক ওস্তাদের ওস্তাদ ছাদেক সর্দারের বাপের খুড়ো জানতো সব। লোকটি ছিল আপন-ভোলা গোছের। সে ছিল চাষী। তার জমি-জায়গাও ছিল, কিন্তু চাষ-আবাদে মন ছিল না। সে গান বাঁধতো। আর সেই সব গান গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতো। লোকটির দেহে ছিল চারটি লোকের শক্তি। অথচ কারুকে কোনদিন একটা চড়া কথাও সে বলতো না।

সকলে একদিন তাকে গিয়ে ধরলে, বললে, "চাচা, ডাকাতের জ্বালায় আর তো বাঁচি নে। দু' পয়সা ঘরে এনে যে রাখবো তারও উপায় নেই।"

তার নাম ছিল কম্‌রালি। লোকে তাকে বলতো 'কবি চাচা'।

কম্‌রালি বললে. "তা আমি কি করবো? আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমাদের সকলের বাড়ি চৌকি দিই। যদি ডাকাত ঠেকাতে চাও তো এক কাজ কর।"

—"কি?"

—"টাকা-পয়সা না থাকে সব জমিদার-বাড়ি দিয়ে এস। তাহলে আর ডাকাতের ভয় থাকবে না।"

—"দিয়ে যে আসবো জমিদার তা রাখতে রাজি হবে?"

—"দিয়েই দেখ।"

—"কিন্তু সেগুলো ফেরৎ যদি না পাই?"

—"আরে বাপু! ডাকাতের হাত থেকে তো বাঁচবে

সৃষ্টিধর বললে, "জমিদার বাড়িতেও তো ডাকাত পড়তে পারে?"

কমরালি একটু ভেবে বললে, "তা পারে।"

—"তবে?"

—"তাহলে যা ভাল মনে করিস্ করগে যা।"

—"জমিদারকে বলেও তো কিছু হয় না এখন আবার পথে-ঘাটেও চলা দায় হয়ে উঠছে।"

কমরালি সে কথার কোন উত্তর দিলে না। পরদিনই সে গাইতে লাগলে ডাকাতে গ্রামগুলোর কি সর্বনাশ করছে তারই গান।

কমরালির কথাটা কারো কারো মনে লাগলো। জমিদারের কাছে যদি সব গচ্ছিত রাখা যায় তাহলে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে বটে। তবে একটা ভয়, শেষকালে কর্তা যদি অস্বীকার করে বসেন! কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবলে 'এখনও তো চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, ধর্মও রসাতলে যায় নি। কর্তা কি এত বড় অধর্ম করতে পারেন?' অবশ্য কর্তার চেহারা দেখলে সে কথা মনে করবার যো ছিল না। তেমন সুপুরুষ মানুষের মধ্যে দেখা যায় খুবই কম। যাদের চেহারা সুন্দর তাদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করতে লোকের বাধে। তবে হাসিটি—?

কমরালিকে এসে তারা সে কথা বললে। শুনে কবির মুখে হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু সে কিছু বললে না।

তারা বললে, "চাচা, কথা কও না যে?"

—"কইবার কিছু নেই।"

তারপর ডাকাতের অত্যাচার গ্রামের মধ্যে কমে গেল। কিন্তু আশ-পাশের গ্রামগুলোতে চলতে লাগলো সমানে। এ গ্রামের অত্যাচার কমে যেতে অন্য গ্রামগুলোর লোকেরা তার কারণ জানবার চেষ্টা করতে লাগল এবং কয়েকদিন চেষ্টার পর জানতেও পারলে।

জমিদার কিন্তু গচ্ছিতকারীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, কথাটা যেন কাক-চিলেও জানতে না পারে। তাহলে আর রক্ষা থাকবে না, একদিন তাঁর বাড়িতেই ডাকাতটা হানা দেবে। সে অঞ্চলে ডাকাতটার নাম, 'হাজার ঠেঙা।' তার ঠ্যাঙ ছিল হাজারটা, ঠ্যাঙাতোও সে হাজার লোককে। বিশ-পচিশ ক্রোশের মধ্যে তার সমান কেউ ছিল না। সে অঞ্চলে আর যে দু'জন জমিদার ছিল তাকে 'কর' দিত। জমিদার দু'জনের লোক গিয়ে শ্মশানে

অমাবস্যার রাতে কালীতলায় মোহর রেখে চলে আসতো আর হাজার ঠেঙার চর সেগুলো তুলে নিয়ে যেত। পছন্দ না হলে মোহরগুলো তেমনই পড়ে থাকতো আর তার পাশে থাকতো একটা মড়ার মাথা।

যাক্, গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকও তাদের জমিদারদের কাছে টাকা-কড়ি গচ্ছিত রাখবার প্রস্তাব করলে। জমিদাররা রাজিও হলেন।

তার কিছুদিন পরেই হাজার ঠেঙা পর পর দু' রাতে মশাল জেলে লাঠি, সড়কি, খাঁড়া, তলোয়ার আর গাদা বন্দুক নিয়ে হানা দিল দু' বাড়িতে। জমিদাররা মনে করেছিলেন গচ্ছিতকারীরা তাদের ধন-দৌলত বাঁচাবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবে। হাজার ঠেঙার ঠ্যাঙ এবার যাবে ভেঙে। সেই ভরসায় হাঁক-ডাক করে তারাও লড়াই বাধিয়ে তুলেছিল। কিন্তু একে শীতের রাত, তার ওপর শত্রুকে কি করে এক যোগে বাধা দিতে হয় সে শিক্ষাও তারা পায় নি। প্রত্যেকেই ভাবতে লাগলো, ওরা লড়াই করুক। জিতলে আমার জিনিসগুলো আর যাচ্ছে কোথায়?

চললো লড়াই। কিন্তু হাজার ঠেঙা লড়াই জানতো। তবুও তার কয়েকজন মারা পড়লো, কয়েকজন হল জখম। কিন্তু জমিদার পক্ষে মরলো ও জখম হলো অনেক। ডাকাতটা জমিদার বাড়ি লুটে-পুটে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তার মরা লোকগুলোর মাথা কেটে, জখম লোকগুলোকে ঘাড়ে নিয়ে সরে পড়লো। দ্বিতীয় জমিদারটিরও হল সেই দশা। যারা ধন-দৌলত গচ্ছিত রেখেছিল তারা হায় হায় করতে লাগলো।

একটা ডাকাতের এতখানি শক্তি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। কম্‌রালি-চাচা ডাকাতেরও একটা গান বেঁধে গাইতে লাগলো। তাতে ছিল লোকে ডাকাতের অত্যাচারে কত দুঃখ পাচ্ছে।—"সংসারে মানুষ সব চেয়ে ভয় করে যমকে। কিন্তু এই ডাকাতটার জন্যে লোকে যমের ঘরেও পালিয়ে বাঁচতে চায়। ছেলেরা কাঁদে মায়ের বুকে, মা কাঁদে ছেলের শোকে, স্বামীর জন্যে স্ত্রী মরে মাথা খুঁড়ে। ডাকাতটা দেশকে করেছে এমন ধারা! খোদাতালা এই শয়তানটাকে টিপে মারবেন জানি। ওর আগুনে ওকেই জ্বালাবেন। কিন্তু এ তাঁর কি মহিমা, তার আগে এত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন কি পাপে?"

চাচার এই গানখানা হল জনপ্রিয়। বাসব বলাই সর্দারের বুড়ী ঠাকুমার মুখে শুনেছিল। অনেক কালের পুরোনো গান। মুখে মুখে গাইতে গাইতে জনে জনে তা একটু একটু করে বদলে মূল থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

চাচা একদিন দুপুরে মাঠের ধারে একটা গাছতলায় বসে গানখানা গাইছিল। দুপুরে বাতাসে তার মাথার লম্বা চুল, মুখের কাঁচা-পাকা দাড়ি উড়ছে, মাঠের ওপর দিয়ে সুর যাচ্ছে উড়ে। তার গলা ছিল ভরাট ও মিঠে।

এমন সময় সেখান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল জমিদার। সঙ্গে ছিল কয়েকজন বরকন্দাজ ও মোসাহেব। চাচা তাকে দেখেও গান থামালো না, সমানে গেয়ে চললো। বরকন্দাজ ও মোসাহেবরা লোকটার বেয়াদপি দেখে গেল চটে। তারা চাচার দিকে তেড়ে যেতেই জমিদার হাত নেড়ে বারণ করলেন।

পরদিন চাচার ডাক পড়লো জমিদার বাড়িতে হুজুরকে গান শোনাতে।

কম্‌রালি লোকটাও ছিল কেমন মেজাজী। সোজা বলে দিত, "তাকেই আমার বাড়িতে আসতে বল।"

চাচার বাড়িতে ছিল দু'খানি মাত্র খড়ের ঘর। লোক গেলে পাটি পেড়ে বসতে দিত, পান দিত, তামাক দিত আর গল্প বলতো বড় মিষ্টি করে।

চাচা জমিদারের পাইককে ফিরালো না, তার সঙ্গে গেল তখনই। এবং জমিদারকে গান শোনালো—ওই হাজার ঠেঙার গান।

গান শুনে জমিদার ভারী খুশী হলেন। বললেন, "কম্‌রালি, মনে হয় তুমি যেন ডাকাতটাকে খুব চেন। তাকে রোজ দেখ। সে কোথায় থাকে তাও জানো।"

চাচা কোন উত্তর দিলে না, গুন্ গুন্ করে গানের রেশ টেনে যেতে লাগলো। এবং এক সময় হঠাৎ বললে, "হুজুর, এবার তবে আমায় যাবার অনুমতি দিন।"

জমিদার বললে, "কম্‌রালি, আমার ইচ্ছে হয় তুমি আমার কাছে থাক। রোজ গান শোনাও। তোমার মুখ থেকে দুটো ভাল কথা শুনি।"

কম্‌রালি বললে, "হুজুর, আপনার দয়া। কিন্তু ঘরে আমার মন টেকে না।"

জমিদার বললে. "আচ্ছা বেশ। তুমি মাঝে মাঝে এস।" বলে তাকে নূতন কাপড়, চাদর, মোহর, লাঠি, মেঠাই দেওয়ালেন অনেক। চাচা সেগুলো বাড়ি নিয়ে চললো। কিন্তু জিনিসগুলো শেষ পর্যন্ত বাড়ি গিয়ে আর পৌছলো না, পথেই বিলি হয়ে গেল।

এবং সেইদিনই সন্ধ্যার পর চাচা যখন বাড়ি থেকে ফিরছিল মন-ভাঙার মাঠ দিয়ে, তখন কে যেন তাকে কেটে ফেললে। মাঠভরা অন্ধকার। মানুষ চেনা যায় না। তখন সেখান দিয়ে আসছিল ছাদেক সর্দারের ঠাকুরদা। সে শুনতে পেল চাচা বলে উঠলো, "শেষে আমাকেও কাটলি রে!"

কথাগুলো শুনে সর্দারের ঠাকুর্দা মাঠে সটান শুয়ে পড়লো। খুনীরা ছুটতে ছুটতে গেল পালিয়ে।

ছয়

জমাট অন্ধকার। সীমাহীন মাঠ। বহু দূর থেকে একপাল শিয়ালের ডাক কানে কান্নার মতো ভেসে এসে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

সর্দারের ঠাকুর্দা মাটিতে কান পেতে শুনতে লাগলো খুনীদের পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু তারা তখন অন্ধকারে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

শেষে সাহসে ভর করে উঠে দেহটির কাছে গিয়ে সে ঝুঁকে দেখে চাচার মাথাটা ঘাড় থেকে প্রায় ছেড়ে গেছে। অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে আছে রক্ত। তাতে তারার আলো পড়ে চক চক করছে।

সে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে ছুটলো বাড়ির দিকে। কম্‌রালির বাড়ি ছিল তারই বাড়ির পাশে।

কম্‌রালির বাড়ির বার-উঠোনে ছিল তার কয়েক পুরুষের কবর। তার মেয়ে ফতিমা সেখানে রোজ সন্ধ্যায় আলো দিত। সেদিন সেখানে আলো দিয়ে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ থেকে সে বাড়ি ঢুকতে যাবে এমন সময় দেখলে, একটা ছায়ামূর্তি উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

তাকে দেখে মেয়েটি প্রথমে চম্‌কে উঠলো।

সে থমকে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে মূর্তিটাকে জিজ্ঞেস করলে, "কে?"

মূর্তিটি সর্দারের ঠাকুর্দার।

ফতিমা তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে কি কথা হল তা জানা যায় নি বটে তবে কম্‌রালির স্ত্রী একবার চীৎকার করে উঠেই যে থেমে গেল তা পাড়া-প্রতিবেশী প্রায় সকলেই জানতো। কান্নার শব্দটা তাদের সকলেরই কানে গিয়েছিল।

তারা ছুটে এল। ফতিমার মুখে খবর শুনে সকলে ভয়ে, দুঃখে, বিস্ময়ে কেমন যেন হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "কে খবর দিলে? কোথা থেকে এল খবরটা?"

কিন্তু ফতিমা সে কথার কোন জবাব দিলে না। তার ভাই ছিল তার চেয়ে ছোট। সে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "কেঁদ না মা। জয়নালকে দেখ। আমি চললাম বাবার কাছে।"

সে একদল লোক নিয়ে মশাল জ্বেলে চললো মনভাঙার মাঠে তার বাবার সন্ধানে।

গ্রামের পর মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে খানিকটা দূরেই রক্তমাখা, মাথা কাটা দেহটি উপুড় হয়ে পড়েছিল। মশালের লাল আলোয় দৃশ্যটি লাগলো বীভৎস। ফতিমা বাবার মৃতদেহটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই, মুখে একটি কাতর শব্দ নেই, যেন পাথরের মূর্তি; কেবল দু' চোখে আগুন জ্বলছে।

কম্‌রালিকে যথারীতি কবর দেওয়া হল। জমিদারবাবু খবরটা শুনেই বড় ব্যথিত হলেন। ঘোষণা করে দিলেন, "যে কম্‌রালির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে দেবেন পঁচিশ বিঘা ধান-জমি, এক জোড়া বলদ আর একটি লাঙল।" তাঁর জমিদারিতে এমন নৃশংস কাণ্ড! তাও কিনা কমরালির মতো গুণী লোককে হত্যা!

এক একটা মানুষ থাকে অল্প বয়স থেকেই তার বুদ্ধি-বিবেচনা হয় ভারী তীক্ষ্ণ। এই মানুষগুলোই অসাধারণ। এরাই পাঁচজনের ওপর নেতৃত্ব করে।

ফতিমা ছিল ঐ ধরণের মেয়ে। তার ওপর বাবার শিক্ষায় তার বুদ্ধি হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার ও স্থির, সাহস হয়ে উঠেছিল সাধারণের সীমার ওপর।

সে জমিদারের ঘোষণাটা শুনে বললে, "বিষয়-সম্পত্তি ঠকাতে, বাড়াতে, লাভ করতে আর দশজনের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে মানুষকে যে কত রকমের কৌশল খাটাতে হয়! চোরকে পরতে হয় সাধুর বেশ, খুনী হয় বৈষ্ণব, মিথ্যাবাদী ভান করে সত্যের, ভক্তির, কুটিল বোকা সাজে। শয়তানের জাল চারধারে পাতা। এই জাল না কাটলে, পুড়িয়ে ছাই না করলে সহজ মানুষের নিস্তার নেই।"

কথাগুলো ঠিক তার তা নয়। তার বাবাই বলতো। সে তার কাছ থেকে শুনেছিল, শিখেছিল।

এই ঘটনার পর থেকে সকলে গেল ক্ষেপে। কমরালি ছিল সকলের প্রিয়। এমনিতেই সকলে ডাকাতের অত্যাচারে ছিল উত্যক্ত হয়ে। তাদের ধারণা হল, এই কাজটাও করেছে ডাকাতে। কিন্তু সে কে তা তারা সব বুঝতে পারছিল না। বললে, "ওকে নির্মূল না করলে কেউ রক্ষা পাবে না।"

তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না, অমন একটা লোক এমন ভয়ঙ্কর, কাজ করতে পারে। কিন্তু পরিশেষে তাদের সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে রাতে ফতিমাদের ঘরে আগুন লাগে। শয়তানটা তাদের পুড়িয়ে মারবার মতলব করেছিল।

লোকে বুঝলো, খুনী আর ডাকাত হল তাদের জমিদার।

গ্রামের সকলে একদিন জমিদারের সঞ্চিত খাবার লুটে নিল এবং সে যাতে এক ছটাকও খাবার না পায় তার জন্যে পাহারা বসালে।

লাগলো লড়াই। জমিদার পক্ষে ও-দলেও ছিল বিস্তর লোক।

দু'পক্ষেরই লোক মরলো, জখম হল। অত বড় বাড়িখানায় গেল আগুন ধরে। এই যুদ্ধে ফতিমা চারধারে ঘুরতে লাগলো অগ্নিশিখার মতো। তারা জমিদারকে টেনে আনলে, কিন্তু ফতিমারও রগে লাগলো একটি গুলি। সে সেখানেই মারা গেল। সকলের মাথায় আগুন জ্বলতে লাগলো আর সে আগুনে পুড়ে মল ঐ ডাকাতটা, তারা তাকে এনে বটতলায় হাড়িকাঠে ফেলে তারই প্রতিষ্ঠিত কালীর সামনে দিল বলি।

জমিদার-বাড়িতে ছিল সোনা-দানা হীরা-জহরৎ অনেক। তার কতক লুট হল, কতক পাওয়া গেল না। লোকে বলতো, "ওর ঘরে আছে ঘড়া ঘড়া মোহর।" তারা সেগুলো খুঁজলো, পেল না।

যাক, জমিদার বংশ তো নির্মূল হল। তার ডাকাতিরও শেষ হল, খুনেরও প্রতিশোধ নেওয়া হল।

এই কাহিনীটি বাসবের কেন যে পথে যেতে যেতে মনে পড়লো তা সে বুঝে উঠতে পারলো না।

চলতে চলতে তার কাহিনীটি মনে পড়লো মাত্র। আর মনে পড়লো, ওস্তাদের বুড়ী দিদিমার অতিথিপরায়ণতা।

তারা ভদ্রলোকের, কায়েৎ-বামুনের ছেলে, গিয়েছিল তার বাড়ি। সে হল নমঃশূদ্র, চাঁড়াল।

বেলা তখন দশটা হবে, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাঠের ওপর দিয়ে শুকনো তপ্ত হাওয়া আসছে ছুটে। তৃষ্ণায় তাদের সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ। সেই অবস্থায় ওস্তাদের বাড়ি গিয়ে ঢুকলো।

ছোট বড় তিনখানি বাংলা ঘর, চালে খড়, বেড়ায় চাটাই, বাঁশের খুঁটি। চালের মাথায় মটকায় বসানো রয়েছে খড়ের ময়ূর। ঝড়-বাতাসে তার লেজ মাথা উড়ে গেছে, রয়েছে কেবল দেহটা। তাও উড়ি-উড়ি করছে।

ওস্তাদের দিদিমা, বয়স হবে নব্বই বছর, গায়ের রঙ কালো, মাথায় কাশফুলের মতো সাদা চুল, চোখে ভাল দেখতে পায় না। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে কি যেন করছিল। জিজ্ঞেস করলে, "কে রে?"

ওস্তাদ বললে, "আজীমা, আমরা?"

বুড়ী বললে, "ও! তোর সঙ্গে কে?"

—"আমার সাগরেদরা। বাসু, ওই আমার দিদিমা।"

ওস্তাদের দিদিমা, গুরুর গুরু, তারা গেল তার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে।

বুড়ী প্রথমটা বুঝতে পারলে না, তারা কে, কোন্ জাত। তাই তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে, "বেঁচে থাক্।"

ওস্তাদের স্ত্রী দিলে একখানা মাদুর পেতে। সে কিন্তু চিনেছিল তারা কে।

বুড়ী বললে, "ওদের হাতমুখ ধোবার জল দে বউ।"

বউ বললে, "ওই যে কুয়ো রয়েছে। ওরাই তুলে নিক।"

কিন্তু হাত-মুখ ধোয়ার জলের চেয়ে তাদের পাঁচজনের তখন খাবার জলেরই একান্ত দরকার। বাসব বললে, "খাবার জল চাই।"

বারান্দার একধারে বসানো ছিল দু'টো সরা ঢাকা মাটির কলসী। পাঁচজনে তৃষিত নয়নে সে দিকে তাকালো!

বুড়ী তখন যেন বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। বললে, "বাবুরা, তোমরা কুয়ো থেকে জল তুলে নাও গে। আমাদের দিতে নেই।"

বাসব বললে, "কেন দিতে নেই? আমাদের একটা গেলাস দাও। আমরা ঐ কলসী থেকে জল ঢেলে খাব।" বলে সে কলসীর দিকে এগিয়ে

যেতেই ওস্তাদের বউ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে কলসী আগলে দাঁড়িয়ে বললে, "ছুঁয়ো না—কলসী ছুঁয়ো না।"

তারা অবাক হয়ে গেল। তাদের জল দিতে নেই, আবার এদের কলসী ছুঁতে নেই!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাদেরই কুয়ো থেকে জল তুলে খেতে হল। ওস্তাদ একখানি কলাপাত কেটে এনে টুকরো টুকরো করে তাদের পাঁচজনের সামনে বিছিয়ে দিলে। বউ এনে দিলে আউস ধানের লাল চিঁড়ে ও মিছরির মতো দানা, সোনার মতো রঙ খানিকটা করে আখের গুড়। তাতে তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়েছিল।

তারপর তারা বেরিয়েছিল গ্রামখানা ঘুরতে। দুপুরের দিকে আমতলায় বসে তারা বুড়ীর মুখে শুনেছিল ওই গল্পটা।

সময়টা তখন চৈত্রের প্রথম দিক। দূরে মাঠের বুকে উড়ছে তপ্ত ঘূর্ণি, যেন ধরিত্রীর তৃষ্ণা কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশের গায়ে জলের সন্ধান করছে। তবুও সেই রোদ মাথায় করেই তারা ফিরেছিল বাড়ির পথে।

সাত

নদীর জল সরে গেছে, চর পড়েছে। তার ওপরে পায়ে-চলা আঁকা-বাঁকা পথখানি পড়ে আছে যেন একটা অজগর। তার মাথাটা উঠেছে বাজারের ঘাট বেয়ে, লেজটা শেষ হয়েছে কোথায় কে জানে! তার পাশে পাশে দু'টি-একটি কেশর, দু-একটি শিয়ালকাঁটার কচি চারা বা আগুনজলা গাছের চাবড়া। একদিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উঁচু পাড়, আর একদিকে আশ্বিনের নদীর অমল জলস্রোত। কূলে নৌকো বাঁধা, যাত্রীর, জেলের, মালের, খেয়ার।

ধুক্-ধুক্ ধুক্-ধুক্ শব্দ করতে করতে একখানি ছোট মোটর লঞ্চ ছুটে আসছিল। লাঞ্চখানাকে চালাচ্ছিল এক সাহেব। নদীর বাঁওড়ের ধারে ওদের কারখানা। লাঞ্চখানা ওদেরই কারখানায় তৈরি। ওরা এখন লাঞ্চ তৈরি করে বেচে। কারখানার পশ্চিমে আছে কুল গাছের একটা বন। বনটা ছাড়িয়ে কতক দূর গেলে দেখা যায় একটা ঘাসে ঢাকা উঁচু বাঁধ। বাঁধটা নাকি অনেককাল আগে ছিল রেলপথ। বাঁধটা ছাড়িয়ে আরও কতক দূরে একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। বড় বড় তার ঘর। ঘরগুলোর দেয়াল

ফেটে গেছে, চুণ-বালি খসে পড়েছে, ভাঙা কার্নিশে গজিয়েছে এক জোড়া বট-অশ্বত্থের গাছ। বাড়িখানাকে দেখলে মনে হয় যেন জঙ্গলের মাঝে পড়ে আছে একটি প্রায় ভুলে যাওয়া গল্প। লোকে ওটার নাম দিয়েছে 'গোরাবাড়ি'। এক সময়ে ওখানে গোরাসৈন্যরা থাকতো।

শীতকালে বাসবরা ঐ বনে কুল খেতে যায়। আশপাশের রাখালেরাও আসে। তাদের সঙ্গে কুল নিয়ে, গাছ নিয়ে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। একধারে চাষী-মজুরের বাস। তাদের মধ্য থেকে বয়স্ক দু-একজন এসে ঝগড়াটা থামিয়ে দেয়। বলে, "ওনারা ভদ্দরনোকের ছেলে, বড় নোক। ওনাদের সাথে কেজ্জে।"

কিন্তু ওদেরই মধ্যে দু-একটা লোক আছে যারা তাদের ভদ্রলোক বা বড়লোক বলে মানে না, এম্নি একটা লোকের সঙ্গে বীরুবাবুর বড় ছেলে হেমন্তবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। বাজারে মাছ নিয়ে দু' জনে দর করছিলেন একই মাছ। দরটা করছিল লোকটাই আগে। হেমন্তবাবু গিয়েই মাছটা দর করে, একরকম কেড়েই, নিজের চাকরের হাতে দিয়েছিলেন।

লোকটা হেমন্তবাবুর আচরণে রুষ্ট হয়; বলে, "আমি যখন দর করেছি আপনি কেন তখন দর করবেন?"

তারপর কথা কাটাকাটি হয়। চড়া কথা শোনা সব ভদ্রলোকের অভ্যাস নেই—বিশেষ করে যারা নিম্নস্তরের তাদের কাছ থেকে।

লোকটির নির্ভীক স্পষ্ট ও শক্ত কথায়, এবং রুদ্র মূর্তিতে হেমন্তবাবুর মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত বীরপণা জেগে ওঠে। তিনি লোকটির চুলের মুঠি ধরে বেশ ঘা কতক লাগিয়ে দেন আর তার সঙ্গে চালান গালাগালি। একে মাছের বাজার, তার ওপর সেদিন আবার ছুটি। বাজারশুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়ে। বাজারের মালিক বোসবাবুদের পিয়াদা এসে লোকটাকেই ধরে চেপে। বীরুবাবু তাদেরই উকিল। হেমন্তবাবু তাঁরই ছেলে।

হেমন্তবাবু গর্জন করতে থাকেন, "বেটা ছোটলোকের আস্পর্ধা!"

ছোটলোকটি ঠিক তখনই পেয়াদার হাত ছাড়িয়ে তাঁর মুখে মারে চড়। তারপর তার যে অবস্থা হয় তা না বলাই ভাল। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেখানে বড়লোকের চেয়ে ছোটলোকের সংখ্যা ছিল বেশি তবুও তারা কেউ এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ালে না!

যখনকার কথা বলছি তখনকার সঙ্গে এখনকার অবস্থার মিল নেই।

কারখানার সাহেবদের কয়েকটা কুকুর এদেশী ছোটলোক উঁচুলোক কাউকেই খাতির করতো না। তাদের চাউনি ও হুঙ্কার ছিল সাহেবী। একবার তো একটা কুকুর উকিলবাবুকেই তেড়ে গিয়ে তাঁর পাশ বালিশের খোলের মতো পেনটুলটা চেপে ধরে খানিকটা ছিঁড়ে দিয়েছিল। বীরুবাবু সাহেবদেরও উকিল। কুকুরটার স্পর্ধায় তিনি কিন্তু দাঁত বার করে খুব হেসেছিলেন আর সাহেবকে বলেছিলেন, "আপনার কুকুরটা ভারী রসিক।" কথাগুলো অবশ্য বলেছিলেন ইংরেজীতেই। বীরুবাবু খুব ভাল ইংরেজী জানেন।

গল্পটা বলেছিলেন বাসবদের পাড়ার পরলোকগত ভগবতীবাবু। তিনি সাহেবের কেরাণী। তাঁর মুখে সব সময়ই থাকতো আফিসের ও সাহেবের গল্প।

বাসব সাহেবগুলোকে দেখতে পারে না। কিন্তু সে মুখ দেখে বুঝতে পারে না কে ইংরেজ আর কে ইউরোপের অন্য দেশীয়। সব কটা চামড়ার লোককে তার মনে হয় ইংরেজ। কিন্তু যে সাহেবটা লঞ্চ চালাচ্ছে ও হল স্কচ। লোকটার নাম অ্যানডারসন। লোকটা বেশ ভাল ফুটবল খেলতে পারে। বুট পরে খেলে। কিন্তু লোকটার ডান পাখানা জখম।

পাখানা জখম হয়েছিল ফুলপুরের জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গিয়ে। ফুলপুর তাদের শহর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে। জায়গাটা একেবারে অজ পাড়াগাঁ। সেখানকার ছেলে-মেয়েরা, স্ত্রীলোকেরা বাইসিক্ল কখন দেখে নি। বাসবরা গত বছর চার বন্ধু মিলে চারখানা বাইসিকলে সেখানে গিয়েছিল বেড়াতে। তারা সকলে এমনভাবে গাড়ি দেখতে ভিড় করেছিল যে, দেখে তাদের হাসি পেয়েছিল। ও অঞ্চলে শীতকালে চিতাবাঘের উপদ্রব হয়। সেবার এসেছিল একটা মানুষখাকী বাঘিনী। তার সঙ্গে ছিল এক জোড়া বাচ্চা। বাঘিনীটা এমন উৎপাত লাগিয়ে দিয়েছিল যে, লোকে গ্রাম ছেড়ে পালাবার উপক্রম করেছিল। এবং আপন আপন প্রাণের পক্ষে মহকুমার হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিয়েছিল। হাকিমটি ছিলেন তাদেরই মতো বাঙালি, তিনি পুরস্কার ঘোষণা করলেন, "যে বাঘটাকে মারতে পারবে তাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

ত্রিশ বছর আগে পঞ্চাশ টাকা ছিল এখনকার দু'শ' টাকার সমান। কিন্তু এ অঞ্চলে যে-সব শিকারী ছিল তারা বধ করতো পাখি; কখন-সখন ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে বা নৌকোয় চড়ে দু'-একটা কুমীরকে গুলি করতো বটে কিন্তু জীবন্ত বাঘিনী চোখেই কখন দেখে নি।

অ্যানডারসন সাহেবের শিকারেও বড় শখ, বিশেষ করে বাঘ শিকারের। দেশে থাকতে সে 'ইণ্ডিয়ার' বহু 'টাইগার' ও 'স্নেকের' গল্প শুনেছে। লোকটা মিস্ত্রি, লেখা-পড়া কম জানে।

অ্যানডারসন সাহেবও দুটি-চারটি হিন্দি, দুটি-চারটি অমার্জিত বাংলা শব্দ, বিশেষ করে গালাগাল শিখেছিল। তার কানে বাঘের খবর গিয়ে পৌঁছলো। সে বন্দুক নিয়ে একদিন লাঞ্চে চড়ে বসলো এবং সন্ধ্যায় গিয়ে ভিড়লো ফুলপুরের ঘাটে।

পরদিন সকালে সে সদলে ঢোল-কানেস্তারা বাজিয়ে, চীৎকার করে বাঘিনীর মেজাজ দিল বিগড়ে। সে তখন একটা ঝাঁকড়া আমগাছের গোড়ায় ঝোপের মধ্যে শুয়ে বাচ্চা দুটোকে দুধ দিচ্ছিল। উঠলো লাফ দিয়ে এবং বেরিয়েও এল। কিন্তু সাহেব ছিল ঠিক তার সামনে একটা মোটা জামগাছের গোড়ায় পিঠ দিয়ে মোড়ায় বসে। তৎক্ষণাৎ চালালো গুলি। সেটা গিয়ে লাগলো বাঘিনীর গায়ে। তাতে বাঘিনীর মেরুদণ্ড



ভেঙে গেল; সে ঘাসের বনে পড়ে গর্জন করতে লাগলো। আবার একটা গুলি গিয়ে বিঁধলো তার ঘাড়ে। বাঘিনী টান হয়ে পড়লো এবং কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো। সকলেই মনে করলো সে মরে গেছে। তবুও কারো তার কাছে যেতে সাহস হল না। তখন সাহেবই উঠে গিয়ে তার মুখে "শা—শের" বলে মারলে এক লাথি। অমনি সে দাঁত দিয়ে কামড়ে

ধরলো সাহেবের পা। কিছুতেই ছাড়ে না। সাহেবের কোমরে ছিল ছোরা। ছোরাখানা খুলে বাঘটার গলায় বসিয়ে দিলে। বাঘিনীর জীবনের শেষ হল। তার বাচ্চা দুটোকে ফুলপুরের রতন দাস ধরে তাদের জমিদারের ছেলেকে দিয়ে এল একদিন ভেট।

সাহেব পা নিয়ে ভুগেছিল অনেকদিন। সে খুবই সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রমাণ দিয়েছিল। তবুও লোকে বলে "বাঙালি বাঘ। তাই সাহেবের ঠ্যাং কামড়ে ধরেছিল।" তারা বলে আর হাসে।

সাহেবটাকে বাসবদের মনে হয় ভাল। কিন্তু কারখানার লোকেরা বলে, "ভারী পাজি।"

মানিকদা একদিন বলেছিলেন,—"এই যে বড় লোকদের দেখছো, ওরা অনেকেই অসাধু। চুরি, জোচ্চুরি, এমন কি ডাকাতি করেই ওরা লাখ লাখ টাকা জমিয়েছে। সামনে থাকে একটা ব্যবসা যাতে লোকের মনে হয় ওদের পয়সা-কড়ি এসেছে সৎপথে।"

বাসবের এ কথা বিশ্বাস হয় নি। সে প্রতিবাদ করে বলেছিল, "কথনই নয়। এ হতে পারে না। জোচ্চুরি করে কেন বড়লোক হবে?"

উত্তরে মানিকদা বলেছিলেন, "বেশি দূর যাবার দরকার কি? ওই যে মাড়োয়ারিটা যুদ্ধে ঘাস সরবরাহের ফরমাজ পেয়েছে ও এই দু' বছরে কিনেছে কতগুলো বাড়ি, খুলেছে শুরকির কল—হিসেব করে দেখ। যে ঘেসেড়ারা ওকে ঘাস কেটে দেয় তারা কি অবস্থায় কাটাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের দাম কত পাচ্ছে? তুমি ওস্তাদের গ্রামে গিয়ে যে গল্পটি শুনে এসেছিলে অধিকাংশ জমিদারীর মূলেই আছে ঐ রকম ব্যাপার। জমিদারের অনেকেই এক সময়ে ডাকাত ছিল, একালেও কোন কোন জমিদারের ডাকাতের, চোরের দল আছে একথা অনেকেই জানে। যারা বড় চাকরি ক'রে টাকা জমায় তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আর তাতে কত টাকাই বা জমে? তাতে এত জমে না যে জমিদার, কারখানার মালিক বা কোন বড় ব্যবসায়ীর মতো আশমান-চড়া চালে চলতে পারে। তবুও এরা সাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চায়! যারা গরীব তাদের বাড়িতে গিয়ে বসতে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তো দূরের কথা, কথা বলতেও ঘৃণা বোধ করে।"

বাসব কথাগুলো শুনে ক'দিন ভেবেছিল। তবুও সত্য বলে মানতে পারে নি।

বাসব চল্‌তে চল্‌তে ফিরে দেখলে লঞ্চখানা দূরে চলে গেছে।

সে ঘাট বেয়ে বাজারে উঠলো। সামনে সোজা রাস্তা। দু'পাশে টিনের ঘরের সারি ও দু'একখানি দালান। পথের ধারে বসেছে তরি-তরকারীর পসরা। লোক গিজ-গিজ করছে। বাসব সেই জনতার মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

আট

বাজারে বাসবের সঙ্গে দেখা হ'ল বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে। বীরেশ্বর রায় এক সময়ে তাদের আখড়ায় বক্সিং লড়তে শেখাতেন। এই শহরেই স্কুলের খ্রীস্টানদের বসতির পূব দিকে তাঁদের বাড়ি। ছোট একখানা একতলা দালান। বাড়িখানার চারধারেই গাছপালা। বীরেশ্বর রায় এখন কলকাতায় এক আফিসে চাকরি করেন। থাকেন মানিকদার সঙ্গে এক মেসে।

তিনি মানুষটা যেন কেমন ধরনের। চোখে খুব মোটা কাঁচের চশমা; শরীরটা থলথলে, মুখখানা গোল, মাথার চুলগুলো কোঁকড়া, কথাবার্তা বলেন কম, হাসেনও কম, অনেকেই তাঁকে পছন্দ করে না। কেউ বলে, "ওটা গোয়েন্দা," কেউ বলে "শয়তান"।

বীরেশ্বর রায় বললেন, "ওহে বাসব, তোমাদের মানিকদাকে যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।"

বাসব চমকে উঠলো, মনে পড়লো এই জন্যই তিনি এবার পূজোয় বাড়ি আসেন নি। জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

—"সে অনেক কথা। ও সব লোকের সঙ্গে আর মিশ না।"

—"এখন তাঁর কি হবে?"

—"মামলা হবে—স্বদেশী মামলা।" বলে বীরেশ্বর রায় আলু বাছতে লাগলেন।

বাসবও বাজার করতে লাগলো। মামলা জিনিষটা সে ভাল করে বোঝে না। তার ওপর সেটি যখন 'স্বদেশী' হয় তখন আরও যেন ঘোরালো হয়ে ওঠে। তার কাছে মনে হয় স্বদেশী মামলা কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েডের

মতো। একবার ধরলে আর বাঁচবার উপায় নেই। বাঁচলেও শরীর আর সারে না।

সামান্য পয়সার বাজার, বেশিক্ষণ লাগলো না। বাজার করে সে চললো বাড়ি। পথে তার কেবলই মনে পড়তে লাগলো মানিকদার কথা। তবে একটা আশার কথা এই ছিল যে মানিকদার এক মামা আলিপুরের খুব বড় উকিল। তিনি হয়তো মানিকদাকে খালাস করতে পারবেন।

বাসব বাড়ি গিয়ে বাজারের থলিটা রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে, মাছটা এক পাশে ফেলে দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বললে, "মা, শুনেছো?"

মা বাটনা বাটছিলেন। বললেন, "কি রে?"

—"মানিকদাকে পুলিশে ধরেছে।"

মা বাটনা রেখে দিয়ে বললেন, "আমাদের মানিককে? বলিস্ কি? কেন?"

—"জানি না।"

—"আহা! কত কষ্ট পাবে। হীরের টুকরো ছেলেটা। সবই কপাল। যা স্বদেশী করতো!"

—"স্বদেশী করা কি দোষের?"

—"না হ'লে এমন হবে কেন?" বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা আবার বাটনায় মন দিলেন।

এই মানিকদাকেই বুড়োরা সুনজরে দেখতেন না। একদল যুবক ঠাট্টা করতো। আবার এঁকেই কত লোক বলে 'মানুষের মত মানুষ'।

তারও যেমন কতকগুলো লোককে ভাল, কতকগুলো লোককে খারাপ লাগে, এই ভাল লাগা না-লাগাটা হয়তো অকারণেই ঘটে।

আরও একটা কথা তার মনে হতে লাগলো, স্বদেশী করা কেন দোষের? দোষেরই যদি হয় তবে নানা দেশের দেশপ্রেমিকদের লোকে বীরের মতো পূজা করে কেন? কেন বা তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন?

বেলা হল। বোন মাধবী এসে বললে, "দাদা, নাইবে না?"

—"নাইবো।"

মাধু গাছের নিচের দিকের একটা ডাল ধরে তার পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, "দাদা, তোমাকে গম্ভীর মানায় না! ভারী ভয় করে।"

বাসব জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালো। অনেকে তাকে বলে, "এত

চঞ্চল হওয়া ভাল নয়।" আবার মাধু বল্‌ছে, "তাকে গম্ভীর মানায় না।" কোন্‌টা ঠিক ?

বাসব মুখে হাসি নিয়ে উঠে পড়লো এবং ভেতরে গিয়ে মাথায় তেল দিয়ে, কোমরে গামছা বেঁধে চললো নদীতে।

মা বললেন, "শীগগির আসবি, সাঁতার দিয়ে বেশি দূর যাস্‌ নি।"

তিনি জানতেন, ছেলেটি একবার নদীতে নামলে সহজে উঠতে চায় না।

বাসব নদীটাকে বড় ভালোবাসে, কেন তা সে পরিষ্কার বলতে পারে না তার স্রোত, তার ঢেউ, তার স্পর্শ, তাকে টানে, ডাকে, ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যেতে চায়। মুগ্ধ করে ওপারের জনহীন তীর, তার ওধারে সীমাহীন স্তব্ধ চর।

বাসব গিয়ে নদীতে নামলো। ছোট ভাই দুটি খেলা করছিল তীরে আশ-পাশের আর দু-তিনখানি বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। বাসব জলে নামলে তাদেরও মজা হয়। তারা তীরে দাঁড়িয়ে দেখে, সে কত রকম করে সাঁতার দিচ্ছে। এক এক সময় ডুব দিয়ে এতক্ষণ থাকে যে ভয় হয় বুঝি ডুবে গেছে।

ঘাটে ছিল অনেকেই। তারও সাথীদের মধ্যে ছিল অজিত ও সুরেশ বাসব সংবাদটি তাদের জানালে।

অজিত বললে, "জেল হবে।"

সুরেশ বললে, "দ্বীপান্তর।"

বাসব বললে, "ওঁর মামা বড় উকিল। কিছুই হবে না।"

কিছু দূরে উকিল অবিনাশবাবু স্নান করছিলেন। বুড়ো উকিল। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কিসের আলোচনা করছো ?"

বাসব বললে, "মানিকদার কথা। তাঁকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে।"

—"তোমরা কি করে জানলে ?"

বাসবের উত্তর দিতে ইচ্ছা হল না, অনিচ্ছায় বিরক্তিতে বললে, "বীরেশ্বরবাবু বললেন।"

—"বীরেশ্বরবাবু কে ?"

বাসব বললে, "ওপাড়ায় থাকেন।"

—"কোন্‌ পাড়ায় ?"

বাসব কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জলে ডুব দিল। এবং হাত কয়েক

দূরে গিয়ে উঠে দেখলে অবিনাশবাবু মুখ গম্ভীর করে গা রগড়াচ্ছেন, অজয় ও সুরেশ পাড় দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

সে চললো সাঁতরে জামতলার ঘাটে, ঘাটটা ভাল নয়। তার ডানদিকে এক জায়গায় পাক আছে। ঘাটটাতে আঠালো মাটিই বেশি, তাই কম লোকে স্নান করে।

বাসব চলেছে সাঁতার দিয়ে।

হঠাৎ তার কানে এল, তীর ও নৌকো থেকে লোকের চীৎকার। সে প্রথমটা তাতে কান দিলে না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তারা যেন তাকেই লক্ষ্য করে চীৎকার করছে। সে ঘাটের দিকে ফিরে দেখলে, জলে কেউ নেই। ডাঙায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সকলে চীৎকার করে বলছে, "কুমীর! কুমীর! ছোঁড়াটা গেল—গেল!"

বাসবের বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারলো। একবার মনে হল, তার জীবনের সেই শেষ। কুমীরটা তাকে এখনি ধরে অথৈ জলে ডুবিয়ে নিয়ে মেরে ফেল্‌বে! পরক্ষণেই মনে পড়লো, সাঁতারের সময় কুমীর ধরতে পারে না। যদি এঁকে-বেঁকে সাঁতার দেওয়া যায় কুমীরের পক্ষে শিকারকে নজরে রাখা হয় কঠিন।

বাসবের শরীরের ও মনের শক্তি দশগুণ জেগে উঠলো। বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে। সেও সাঁতারে চললো এঁকে-বেঁকে তীরের দিকে। তার নিজের পা ও হাতের আঘাতে জলে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে নদী ডাকছে কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌। কুমীর ও এক কিশোরে চলছে পাল্লা।

ঐ যে ঘাট—ঐ যে ডাঙা—এই যে পায়ের নিচে মাটি—এই যে তীর! বাসব মাটি আঁকড়ে ওপরে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে একেবারে এলিয়ে পড়লো। দেখলে কুমীরটাও হুস্‌ করে কিছু দূরে ভেসে উঠলো। তারপর বার কয়েক ঘুরপাক দিয়ে, লেজ আছড়ে ব্যর্থ রোষে অতলে ডুবে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে পিছন থেকে তাকে টেনে তুললে।

সে ফিরে দেখলে, মা। মাধু কাঁদছে। মা হয়তো কাঁদছিলেন। তাঁর চোখ দুটো ভিজে, মুখখানি থমথমে, মাথার চুলগুলো খুলে পড়েছে, মাথায় ঘোমটা নেই, যেন পাগল হয়ে গেছেন।

তাকে তুলে প্রায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কোন্‌ দিন তুই এমনি করেই চলে যাবি।"

বাসব উত্তর দিতে পারলে না, অবসন্ন দেহে আস্তে আস্তে মার পাশে পাশে চলতে লাগলো।

ঘাটে জড় হয়েছিল নানা বয়সের মানুষের ভিড়। তাই তার উদ্দেশ্যে মিঠে কড়া নানা কথা বর্ষিত হ'তে লাগলো।

যেতে যেতে বাসব অনুভব করলে কে যেন তার হাত ধরলে। ফিরে দেখলে তার ছোট ভাইটি।

বাসবের মন দুলে উঠলো। তাকে এত লোকে ভালোবাসে!

নয়

যারা ঘটনাটা দেখেনি, সন্ধ্যায় বারোয়ারি তলায় যখন সকলে ঠাকুর দেখে এক জায়গায় বসে গল্প করছিল। তখন সুরেশ বললে, "বাসুর কি সাহস!"

বাসব চুপ করে রইলো। কথাটা ওপাড়ার হরিপদ ও মহেশের ভাল লাগলো না। হরিপদ বললে, "ও রকম সাহস সকলেই দেখাতে পারে। বাঘে তাড়া করলে মানুষ পালায় না? পালিয়ে বাঁচলেই বীরত্ব হল?"

অজিত বললে, "আরে বোকার মতো লড়াই করে মরলেই বীর হল? ওর হাতে কোন অস্ত্র ছিল?"

মোহিনী বললে, "তুই একবার যা না দেখি? ও রকম হলে তুই 'মা—আ—' বলেই অজ্ঞান হয়ে বালির বস্তার মতো তলিয়ে যেতিস্।"

হরিপদ বললে, "আমাদের গ্রামের নিচ দিয়েও এই নদী গেছে। সেবার একটা চাষার ছেলে কুমীরের মুখ থেকে বেঁচেছিল। তাহলে বল সেও সাহসী?"

—"নিশ্চয়।"

সুরেশ বললে, "এই রকম করে সাঁতারে?"

—"না। কুমীর তার পা কামড়ে ধরেছিল।"

—"তারপর?"

—"দুটোতে টানাটানি। শেষে চাষারা এসে ঠেঙিয়ে কুমীরটাকে সাবাড় করে দেয়।"

মোহিনী বললে, "তাহলে চাষারাই সাহসী, ছেলেটা নয়। আচ্ছা, দেখা যাবে বাচ খেলার দিন। তোকে জলে ফেলে দেব—"

বাসব হাসতে হাসতে বলে উঠলো, "ও যাবেই না আমাদের সঙ্গে—"

হরিপদ আর সেখানে বসলো না, উঠে গেল। মহেশও একটু পরে "আসছি" বলে সরে পড়লো।

তারাও ক'জনে একটু পরে উঠে দল বেঁধে চললো বাড়ি। পশ্চিমে বাঁশঝাড়ের মাথায় তখন চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। পথে ছায়ামাখা জ্যোৎস্না লেগে আছে। বারোয়ারিতলার ঢাকের আওয়াজ আসছে ভেসে। স্ত্রীলোকেরা চলেছে বারোয়ারিতলার দিকে দল বেঁধে ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম চুকিয়ে। শিশুরা করছে কলরব।

বাসবরা চললো নদীর ধারে। বাচের নৌকো সেদিনই বিকেলে ঠিক হয়ে গেছে। একসঙ্গে দশ-বারোজন উঠবে। তাই পানসি ভাড়া করেছে। বাসব মনে মনে ঠিক করেছে, সেদিন যে খানকয়েক ছিপ বাচ খেলবে সে তার একখানিতে উঠবে।

বাসব মতলব করেছিল, তার সহপাঠী ইয়াকুবের বাড়ি গিয়ে তাকে ধরে তার বাবার যে ছিপখানা বাচ খেলবে তাতে সেদিন উঠবে, আর ছোট ভাই দুটিকে তার জায়গায় দেবে পানসিতে। পানসিখানা সকলে চাঁদা করে ভাড়া করেছে। প্রত্যেকের ভাগে পড়বে চার আনা করে।

সকলে নদীর ধারে গিয়ে বসলো। সব নিঝুম, নিথর। গাছ-পালা ঘুমোচ্ছে, ওপারে চরভরা ঘুম, এপারে তটের চোখে ঘুম আসে আসে। আর নদী যেন এ দুইয়ের মাঝে দেহ এলিয়ে দিয়েছেন মা। মা যেমন সারাদিনের ক্লান্তির পর দুটি শিশুকে দু'পাশে নিয়ে শুয়ে, ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে আধঘুমে তাঁর নিজেরও চোখ দুটি জড়িয়ে আসে।

তাদের মধ্যে মোহিনীর গানের গলা ছিল। সে একটা গান ধরলে। পুরোনো পচা গান। তবুও সে গাইতে লাগলো। আর সকলে তার সঙ্গে সুর ধরলে। কেবল বাসব চুপ করে ভাবতে লাগলো ভাসানের দিনের বাচ খেলার কথা।

তার মনে হল, সে যেন হয়েছে এক বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি। তার অধীনে আছে বিরাট নৌবহর। সেই নৌবহর চলেছে সাগরে সাগরে, দেশ-দেশান্তরে। তার মাস্তুলে উড়ছে তাদের জাতীয় পতাকা।

হঠাৎ বিজয় বলে উঠলো, "আরে সাপ—সাপ!"

সকলে লাফিয়ে উঠলো। চরে তখনও জ্যোৎস্না লেগে ছিল। সেই আলোয় তারা দেখলে, সত্যিই একটা সাপ বালির ওপর দিয়ে চলেছে। তার কালো গা চিক চিক করছে। সাপটা পাড়ের ছায়ায় সরে গেল।

তারাও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চললো বাড়ির দিকে।

দশ

রাত তখন বোধ হয় বারোটা হবে। হঠাৎ গোলমালে বাসবের ঘুম ভেঙে গেল।

কে যেন বললে, "আগুন! আগুন!"

বাসব এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে বাজারের দিককার আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে।

কে যেন শিষ দিলে। বাসব কোমর বেঁধে চললো তাদের সেবা-কেন্দ্রে। এ শিষ তাদেরই প্রত্যেককে ডাকবার সঙ্কেত।

তারা যখন সেবা-কেন্দ্রে গিয়ে পৌছলো তখন খবর পেল শহরের বাইরে পাটের গোদাম জ্বলছে। জায়গাটা তাদের এলাকার বাইরে। তাদের ক্যাপটেন বললে, "আমাদের কিছু করবার নেই। তবে সতর্ক থাক। আগুনটা শহরে এগিয়ে এসে আর কোথাও না লাগে।"

সকলে সেখানে বসে রইলো। বাসব উঠলো গাছে। সে সেখান থেকে আগুনের জায়গাটা কতকটা দেখতে পেল। বললে, "ও-ই দিকে—শহরের বাইরে। উঃ, কি ফুল্‌কি উড়ছে!"

শরৎকাল, তাই বাতাস ছিল না। সে বাতাস ফুল্‌কিকে বেশি দূর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তবুও সকলে সেখানে প্রতীক্ষায় রইলো।

ভোরের আগে সে আগুন নিভলো না।

এগার

বাসবের ঘুম ভাঙলো বেলায়।

তার উঠতে দেরি দেখে ছোট ভাইটি বাজারে চলেও গিয়েছিল।

বাসব মুখ-হাত ধুয়ে প্রতিদিনকার মতো সফেন ভাত খেয়ে বললে, "মা, আমি যাচ্ছি বাজারের দিকে কাল যেখানে আগুন লেগেছিল সেখানে—"

মা বললেন, "শুনেছিস্ কি হয়েছে ?"

—"কখন্ শুনবো ?"



—"কালকের আগুনে দুটো লোক পুড়ে মরেছে।"

—"কার কাছে শুনলে ?"

—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলে যে বলাবলি করছিল।"

—"আচ্ছা, আমি তো যাচ্ছি।"

—"গিয়ে কি হবে ?"

বাসব মায়ের সুন্দর, শান্ত, করুণ মুখের দিকে দু' চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো।

"—তুই এখন বেরুলে ফিরবি কখন্ ?"

—"যদি বেলা হয় ভেবো না।"

বাসব বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁশতলা দিয়ে মুচিপাড়ার পাশ দিয়ে গিয়ে পৌছলো রেললাইনে। এবং তার ওপর দিয়ে চললো বাজারের দিকে।

পাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে ভাবতে এমন আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিল যে পিছনে যে গাড়ি হুইসল দিচ্ছে তা তার কানেই পৌছাচ্ছিল না। সামনে ছিল গুমটি। গুমটিওয়ালার ধমকে সে চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে পায়ে চলা পথটিতে নেমে গেল। ওই গাড়ি আসছে—কালো ইনজিন্, সাদা ধোঁয়া!

একখানি মালগাড়ি তার পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে ঝড়ের শব্দে চলে গেল।

বাসব আবার লাইন ধরে বাজারের পাশে গিয়ে পৌছলো। এবং বাজার ছাড়িয়ে, স্টেশন ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লো ব্যাপারী পাড়ায়। সেখানে আছে কেবল বড় বড় গোদাম বা আড়ৎ—ধানের, পাটের, তিসির, তিলের। জায়গাটায় কেমন একটা ঝাঁঝালো মিশ্র গন্ধ। আড়ৎগুলোর পর একটা বাব্লার বন। সেটা ছাড়ালে একখানা বড় মাঠ। তারপর শ্মশান। শ্মশানের পর খাল। খালের ওপারের গাঁয়ে ইয়াকুবদের বাড়ি।

বাসব দেখলো, আড়তে মজুরেরা কাজ করছে। তাদের মধ্যে মুসলমানই চৌদ্দ আনা। তাদের মুখে দাড়ি, চাওড়া বুকের ছাতি, কালো কষ্টিপাথরের মতো গায়ের রঙ, মুখে রূঢ় অশ্লীল ভাষা লেগেই আছে। মজুরেরা দু'জন দু'জন করে বড় বড় বস্তা বইছিল, প্রকাণ্ড কাঠের দাঁড়ি-পাল্লায় পাট ওজন করছিল, বাণ্ডিল বাঁধছিল। তাদেরই মাঝে শস্যের আড়তে কাজ করছিল বর্ষিয়সী মেয়ে-মজুরেরা—কালো রঙ, শুকনো শক্ত দেহ, পরনে ময়লা কাপড় গাছ-কোমর বাঁধা। তাদের বয়স অল্প। কারো কারো সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়েও এসেছে। ছেলে-মেয়েগুলি উলঙ্গ, কালো, ধূলি ধূসরিত ও পেট-সর্বস্ব। তারা ধুলো থেকে শস্য কুড়িয়ে খেলা করছে, ছুটছে, হাসছে।

পাড়াটার ভেতর দিয়ে একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে বাসব দেখল এক জায়গায় অনেক লোক, লাল পাগড়ি, ভস্মস্তূপ ও তা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

বাসব ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখে দুটি দগ্ধ দেহকে টেনে এক ধারে

পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হয়েছে। তারা এমনভাবে পুড়ে, বিকৃত হয়ে বেঁকে গেছে যে চেনা তো দূরের কথা তাকানোই যায় না।

কি করে যে আগুন লেগেছিল কেউ জানো না। গোদামটা পাটের। মালিক চৈতন্য সাহা। বাসব চৈতন্য সাহাকে দেখেছে। তার গলায় কন্ঠি, হাতে হরিনামের ঝুলি, পরণে আটহাতি থান, পায়ে খড়ম, কপালে তিলক, চোখ দুটি লাল। লোকে বলে চৈতন সা টাকার কুমীর। সকলকেই নমস্কার করে, সকলকেই 'বাবু' বলে।

কে যেন বললে, "রেশারেশি করে আড়ৎটা পুড়িয়েছে। সাজি মশাইয়ের সঙ্গে হাইকোর্টে বিষয় নিয়ে মামলা হচ্ছে—"

বাসবের সে সব কথা শুনতে ভাল লাগল না। তার মন ব্যথিয়ে উঠছিল সেই দুটি দগ্ধ লোকের জন্য। একজন বলছিল 'তারা সাজি মশাইয়েরই লোক। রাতের বেলা নাকি আড়তে শুয়েছিল। রোজই শোয়। কাল যাত্রা শুনে এসে একটু রাত করে শুয়েছিল। তারপর এই কাণ্ড। ওদের বাড়ি হল চট্‌রা গাঁ।' চট্‌রা গাঁ বেশিদূর নয়। সেখান থেকে আধক্রোশ হবে। দু'জনের বাড়িতে বউ, মা, ছেলে মেয়ে আছে। এখন তারা খাবে কি?

এমন সময় আর একজন বললে, "এটা সাজি মশাইয়েরই কাজ। ক'দিন ধরে পাট সরাচ্ছিল। কাল লাগলো আগুন।"

—"সাজি মশাই আসেনি?"

—"না। সে নাকি শুনে কেবলই বলছে, 'প্রভুরই ইচ্ছা'।"

হঠাৎ বাসবের কানে এল স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ।

তার পাশের লোকটি বললে, "ওদের বউ, ছেলেমেয়ে এল। আহা!"

বাসব আর দাঁড়ালো না, তার দাঁড়াতে ইচ্ছা হল না, সে চলল শ্মশানের দিকে।

সামনে নির্জন বাব্‌লা বন। তলায় পড়ে আছে শুক্‌নো কাঁটা, পাতা ও ছালের ঝাঁঝালো গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী। একটা দোয়েল একটা গাছের ডালে বসে শিষ দিচ্ছিল আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আর একটা গাছে বসে কয়েকটা চড়ুই বাধিয়ে ছিল ঝগড়া।

সে খালের ধারে গিয়ে পৌছলো। খালে খেয়া বয়। তখন একখানা খেয়া ওপারে যাবার আয়োজন করছিল। পাটনি তার চেনা। ভাল লাঠি খেলতে পারে। নাম ভগবান।

বাসব গিয়ে খেয়ায় উঠলো।

ভগবান বললে, "কি গে বাসু, কোথায় যাবে?"

বাসব বলল, "ইয়াকুবদের বাড়ি।"

—"এত বেলায় যে?"

—"বেলা আর কৈ? দশটা হবে।"

ছোট খাল, অল্পস্রোতে সামান্য সময়ের মধ্যেই খেয়া পারের ঘাটে ভিড়লো। বাসব নেমে পাড়ে উঠে ক্ষেতের পাশ দিয়ে আলের ওপর দিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে গিয়ে ঢুকলো।

গ্রামের মুখেই নিকারিপাড়া। কোথাও জাল শুকোচ্ছে, কেউ বাঁশের বাতা চাঁছছে, কেউ বসে তামাক খাচ্ছে। কোথাও দু' তিনটি লোক বসে দোয়াড় ও পোলো বাঁধছে, কেউ জাল বুনছে আর গল্প করছে। সমস্ত পাড়াটায় আঁশটে গন্ধ।

বাসবের মনে পড়ল এইখানেই গত বছর তার মুখে 'স্বদেশীর' কথা শুনে এক বুড়ো বলেছিল, "তুমি বড় হয়ে উকিল হবে।"

সে বুড়ো ইয়াকুবের আত্মীয়। মাস কতক আগে কলেরায় মারা গেছে।

কিন্তু সে ইয়াকুবদের বাড়ি গিয়ে শুনলো সে গেছে জোলাপাড়া।

জোলাপাড়াটাও বাসব চিনতো। সেখান থেকে বেশিদূর নয়, সামনে আমবাগানটার ওপারে। তাঁতের খট্ খট্ আওয়াজ আসছিল। বাসব বাগানখানা পার হয়ে জোলাপাড়ায় ঢুকে খান দুই বাড়ি ছাড়াতেই এক জায়গা থেকে কে যেন বলে উঠল "কে যায়?"

বাসব ফিরে দেখল ইয়াকুব। ইয়াকুবের হাতে হুঁকো। সে তামাক খাচ্ছিল। বাসব জানতো যে সে তামাক খায়। বাসব এই জন্য ক্লাসে তাকে ঠাট্টাও করেছে অনেক দিন, তবুও বদ্ অভ্যাসটা ছাড়াতে পারে নি।

বাসব গিয়ে বসলো ঝকঝকে নিকানো দাওয়ায় একখানা তেলচিটে ময়লা পুরোনো পাটির মাদুরে। ঘরে তাঁত চলছিল। দাওয়ায় বসে ইয়াকুবের স্যাঙাৎ লাটাই গোটাচ্ছিল, সামনে উঠোনে জোলা-বউ ঘুরে ফিরে টানা দিচ্ছিল। জায়গাটাতে মাড়ের মিঠে গন্ধ।

ইয়াকুব এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "বাসু, কি জন্যে এসেছো?"

—"বেড়াতে।"

—"এত বেলায়?"

—"এস্নি।" বলে সে উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কেমন করে তাঁত চলছে। দেখলে, ছিট তৈরি হচ্ছে। তাঁত চালানো সে আগেও দেখছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।

কিন্তু সেখানেও তার দাঁড়াতে ভাল লাগলো না। বললে, "ইয়াকুব, চললাম।"

—"এলে যখন তখন খানিকটা বস। চল আমাদের বাড়ি!"

—"কি হবে গিয়ে?"

বাচ খেলার কথা তাকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা ছিল না, তবুও সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

ইয়াকুব বললে, "এবার কি একটা গোলমাল হয়েছে। বাপজানের দেহও ভাল না। তাই খেলা হবে না। তোমরা বাচ খেলবে না? তোমাদের তো পরব।"

—"বাচ আর কি খেলব? নৌকোয় বেড়ালেই হবে।"

—"তোমার মনটা বুঝি ভাল নেই বাসু? মাঝে মাঝে তোমার কি হয় বল তো?" বলে ইয়াকুব তার কাঁধে হাত রেখে মুখের দিকে জিজ্ঞাসা ভরা চোখে তাকালে।

বাসব হেসে ফেললে, বললে, "কিছু না।"

—"হাঁ হয়। তুমি ভাবুক কবি। কি ভাব অ্যাঁ?"

বাসব চুপ করে রইল।

—"চল আমাদের বাড়ি।" বলে সে বাসবের হাত ধরে টানতে টানতে তাদের বাড়ির দিকে নিয়ে চললো।

বার

শহরের শেষে একটি জায়গায় সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। সেদিন হাটবার। ইয়াকুবদের একখানি নৌকো পণ্য নিয়ে হাটে আসছিল। ইয়াকুব বাসবকে তাতে তুলে দিলে।

ছইহীন বড় ডিঙি। দাঁড়ি, মাঝি ও বাসবকে নিয়ে চার জন যাত্রী। দু'জন দাঁড়ে বসলো। নৌকো ধীরে চলল উজানে। বাজারে মনমরা ভাবটা কেটে গেল।

সে দাঁড়িদের একজনকে চিনতো। সে সম্পর্কে ইয়াকুবের ভাই হয়। নাম তোরাব। বয়স হবে বছর বিশেক। বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান। বাসব বললে, "তোরাব, আমাকেও দাঁড় টানতে দাও।"

তোরাব বললে, "এই রোদে তুমি পারবে ?"

—"কেন পারবো না ? তোমরা পারছো কি করে ?"

যাত্রীদের একজন মাথায় গামছা দিয়ে নৌকোর মাঝখানে বসেছিল। লোকটি প্রৌঢ়। বললে, "বাবু, আমরা হলাম চাষা। আমাদের দেহ যত টনকো ভদর লোকের কি তাই হয় ?"

বাসব বললে, "কেন হয় না ?"

কেন হয় না, সে কথাগুলো গুছিয়ে বলবার শক্তি লোকটির ছিল না। তবু বললে, "ভদ্দলোকেরা কি থরা, পানি আমাদের মত সইতে পারে ? আমরা এক সন্ধ্যে চারটে ভাত খেয়ে ভরদিন বলদের মতো মেহনৎ করি।"

বাসব তা জানতো, কিন্তু একথা জানতো না, এই সহনশীলতা ও কর্মশক্তির উৎস কোথায়।

বাসব লোকটির সঙ্গে আর তর্ক করলে না; তোরাবকে আবার বললে, "তোরাব ভাই, তোমার দাঁড়টা আমায় দাও না ?"

তোরাব অবশ্য তার অনুরোধ রাখলে না; তার জুড়িদার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এস।"

তার ওঠার কারণও ছিল। ক'জন তখন ডাবা হুঁকোয় একটা নূতন কলকে চড়িয়ে এক টান দিয়ে ষ্টীমারের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিল। চিটে গুড় মাখা কাটা তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধে বাসবের মাথাটা চিন্‌চিন্ করে উঠলেও, সে মধুলোভী মৌমাছির মতো মেতে উঠছিল বলে মনে হল। সে এগিয়ে এল হুঁকোওয়ালার কাছে আর বাসব গিয়ে দাঁড়ে বসলো। এবং নদীতে ঝুঁকে হাত দিয়ে একটু জল তুলে দু'হাতের তালু ভিজিয়ে, দাঁড়ে মোটামুটি তার ছোট হাত দু'খানি দিয়ে ধরে তোরাবের সঙ্গে সমান তালে টানতে লাগলো। নৌকো একটু দুলে উঠে চললো আগের চেয়ে জোরে।

মাঝি বললে, "খোকাবাবু, তুমি আমাদের চাষার ছাওয়ালের মতো দাঁড় টানিতেছ।"

নৌকো যাচ্ছিল পাড়ের কাছ দিয়ে। উঁচু পাড়। মাঝে মাঝে ভেঙে

পড়েছে। কোথাও দোয়াড় পাতা; কোথাও টানা জালের খুঁটি পোতা। তার গায়ে স্রোত ধাক্কা খেয়ে ধারার মতো বয়ে চলেছে। তীর দিয়ে পসরা মাথায় মেয়ে ও পুরুষ দু'জন-চারজন করে যাওয়া-আসা করছিল আর নিজেদের মধ্যে গল্প বলছিল—বোধহয় সুখ দুঃখের।

তোরাব দাঁড়ে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বললে, "হেঁঃ! এস বাসু।"

বাসবের পৌরুষ জেগে উঠলো। সে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড় টানতে লাগলো। সামনে গুণ টেনে যাচ্ছিল দু'খানা নারকেল বোঝাই ঢাউস নৌকো। তারা তাদের ছাড়িয়ে গেল। বাসব ও তোরাবের উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগলো।

সে আরও জোরে টানতে লাগলো। সামনে ব্যাপারি-পাড়ার ঘাট। সেখানে বড় বড় নৌকো বাঁধা—ধান, পাট, নারকেল প্রভৃতি জমা এসেছে এবং কতকগুলো বোঝাই হচ্ছে। বাসবদের নৌকাখানার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপারিঘাট। তারা গিয়ে সেই ঘাটে ভিড়লো। এবং বাসব যখন নৌকো থেকে নেমে ডাঙায় উঠলো তখন তার শরীর ক্লান্ত, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। পা দু'খানা টলছে। নদীর ধারের পথটা অপেক্ষাকৃত সোজা। সে সেই পথেই বাড়ি এসে পৌঁছলো। বেলা তখন অনেক।

ভাইয়েদের সকলের খাওয়া তখন হয়ে গেছে, মা বসে আছেন তার জন্য। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "তোর এ কি মূর্তি? মুখখানা কালি হয়ে গেছে; চোখ দুটো লাল। কোথায় গিয়েছিলি?

বাসব বললে, "কাজিরপুর।"

—"এই না তুই আড়তের আগুন দেখতে গিয়েছিলি?"

"সেখান থেকে গিয়েছিলাম।"

"এত বেলায় আর চান করিসনি। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে খেতে বস।"

—"এই গরমে চান না করলে মরে যাবো।" বলে বাসব গামছাখানা নিয়ে চললো নদীতে। মাথায় মাখবার তেল সবদিন জোটে না, জুটলেও মাখতে ইচ্ছা করে না।

বেলা দুপুর। সে ঘাটে গিয়ে নামলো। শূন্য ঘাট। এক জায়গায় একটি বক চুপ করে জলের ধারে তীক্ষ্ণ ঠোঁট উঁচিয়ে বসে আছে। মাঝগাঙে একটা শুশুক হুস করে উঠে আবার ডুব দিল। পাশে একটা কচ্ছপ জল থেকে মাথা তুলে যেন তাকেই দেখে তলিয়ে গেল। তীরে

জামগাছের কোলে বসে একটা চিল তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে উঠলো। ওপার দিয়ে একখানা ডিঙি অলসের মতো ভাটিতে ভেসে যাচ্ছে। দূরে বোধহয় পশ্চিমে রাস্তা থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। নদীর নীল জল রোদে তলোয়ারের মতো চক্ চক্ করছে। বাতাসের স্পর্শে বাসবের শরীর একটু আরাম পেলেও শিউরে উঠলো।

মাথার দুটি রগ এবারে যেন কেমন টন্‌টন্ করে উঠলো।

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে নদীতে নেমে কয়েকটা ডুব দিয়ে, ডাঙায় উঠে মাথা মুছতে মুছতে বাড়ি চলে গেল।

খেতে বসেও তার শরীরটা তেমন স্ফূর্তি পেল না। যেন অনিচ্ছায় ভাতগুলি গিলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

মা আশ্চর্য হলেন। দুপুরে সে কখনও ঘুমায় না।

সন্ধ্যার দিকে মা দেখলেন বাসব তখনও শুয়ে। ডাকলেন সাড়া পেলেন না। কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে দেখেন, আগুন।

দরিদ্রের ঘরে ছেলে-মেয়ের অসুখে প্রথমটা যা হয় এখানেও তাই হল। কোন চিকিৎসাই হল না। চিকিৎসক পয়সা না দিলে আসে না, পয়সা না দিলে ওষুধও পাওয়া যায় না। তবুও পাড়ায় ছিলেন এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। নাম সতীশ বিশ্বাস। তিনি জীবনে স্কুলে পড়েছিলেন সাতবছর। তাঁর পিতাঠাকুর লোককে টোট্‌কা ওষুধ দান করতেন এবং স্থানীয় আদালতের ছিলেন মুন্সি। তিনি মারা যাবার পর পুত্র পড়া ছেড়ে দিয়ে হানিমানের বাংলা গ্রন্থ পড়ে ঔষধের বাক্স ও স্টেথসস্কোপ কিনে বাজারের এক ধারে একটি ছোট টিনের ঘরে আলমারি, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি দিয়ে সাজিয়ে ডিসপেনসারি খুলে দিলেন। সেখানে সন্ধ্যায় বসতো আড্ডা, পুড়তো তামাক, চলতো আলোচনা এবং সকাল-বিকাল রোগীও আসতো। তিনিও একটি বলদে ঘোড়ায় চড়ে যেতেন শহরের বাইরে গ্রামে, নদীপারে গ্রামান্তরে চাষীদের বাড়ী রোগী দেখতে। তাঁর নাম ছিল খুব, অবশ্য সাধারণের মধ্যে ; খাতিরও ছিল বেশ। আর পয়সাওলা শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল বদনাম। তাঁর রোগীর অভাব ছিল না। কলেরা, আমাশয়, পেটের অসুখের সময় তাঁর পড়তো মরশুম।

লোকটির গায়ের রঙ কালো ; শরীরটি বেঁটে থলথলে, গোঁফজোড়া প্রকাণ্ড ও কাঁচা-পাকা, মাথার চুলগুলি গোল করে ছাঁটা, মুখখানিও

গোল, চোখ দুটি বড়, গালে সব সময়ে পান। পোশাকের মধ্যে কি শীত কি গ্রীষ্ম গায়ে একটি ছিটের কোট, বুকে চাদর বা আলোয়ান বাঁধা। শীতকালে মাথায় জড়াতেন কম্‌ফর্টার, পায়ে দিতেন মোজা ও স্থানীয় আবদুল কারিগরের তৈরী পুরু সোল ফিতে বাঁধা কালো বার্ণিশ জুতো।

বাসবের ছোট ভাইটি সন্ধ্যার একটু পরে গিয়ে ডিসপেন্‌সারিতে হাজির হ'ল।

ডাক্তারবাবু তখন সবে একটা শক্ত কেস্‌ দেখে ফিরছেন। বাসবের ছোট ভাইটিকে চিনতেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে সুবো ?"

তার নাম সুবোধ। বেচারী ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল।

বললে, "দাদার খুব জ্বর। মা বললে—"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কবে হয়েছে ?"

—"আজ সন্ধ্যায়।"

—"আচ্ছা। যাবো…"

সুবোধ আরও যেন কি বলতে চাইলে কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, "যা, বাড়ি যা।"

এবং একটু রাত্রে বাসবকে দেখতে এলেন। দেখে কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। রোগীতো বেহুঁস। তবুও মাকে সাহস দিলেন, "ভয় নেই, ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে। সুবো, একটা শিশি নিয়ে আয়।"

দরজার পাশ থেকে মা মাধুকে ফিসফিস করে কি বললেন। মাধু বললে, "আপনার ফি পরে দেবো। দিদিকে দাদার অসুখের কথা লিখছি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা। আমার ফিয়ের কথা লিখতে হবে না। চল সুবো।"

সুবো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে শিশি নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের বাড়ির খানকয়েক বাড়ির পরেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি।

মা মনে মনে ডাক্তারকেই আশীর্বাদ করলেন, 'ভাল হোক।'

কিছুক্ষণ পরে সুবোধ ওষুধ নিয়ে এল।

রোগীকে কোন রকমে একদাগ খাওয়ান হল, কিন্তু তার চোখ দুটো আর খুলল না।

তের

পরদিনও বাসবের কাটলো তেম্নি অবস্থায়।

বয়সের অনুপাতে মাধুরীর বুদ্ধি একটু বেশি। বললে, "মা, আজ নবমী। সবাইয়েরই দাদারা, ভাইয়েরা কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, আর আমার দাদা জ্বরে বেহুঁস।"

ঠিক এই কথাটি মায়ের মনেও উঠছিল। তিনি শুধু ম্লান হাসলেন।

মা তবুও বাসবের ছোট দুটি ভাই ও মাধুকে বললেন, "তোরা যা, ঠাকুর দেখে আয়। বচ্ছরকার দিন! আবার বছর পরে আসবে এই দিনটি। যা কপাল! সেই দিনটা যদি—"

মাধু বললে, "ওরা দু'জনেই যাক্।"

সুবোধ বললে, "আমি ঢের ঠাকুর দেখেছি। কি হবে দেখে?"

তার এ কথাটি বলবার একটু কারণও ছিল। ঠাকুরের ওপর তার মনে একটু রাগ জমে উঠেছিল। তার ধারণা হয়েছিল, ঠাকুর ইচ্ছা করেই তার দাদাটিকে শয্যাশায়ী করে রেখেছে।

মা তবুও বললেন, "যাও তোমরা। দেখে এস—"

মাধু বললে, "দাদা যদি ভাল থাকে সন্ধ্যায় যাবো।"

সুবোধ কিছুই বললে না। তাদের বাড়ির পিছনে ডোবার ধারে বাঁশ-ঝাড়ের এক পাশে তেঁতুল গাছটার ডালে তখন যে হলদে পাখিটা এসে বসেছিল সে তাকে একমনে দেখছিল। দাদা বলেছিল, একটা হলদে পাখি একদিন ধরবে। সে জন্য তারা দু'ভাই একটা বাঁশের খাঁচাও তৈরি করেছিল। দাদা ভাল থাকলে সে পাখিটাকে আজ নিশ্চয়ই ধরতো। পাখিটা বোধ হয় সেই ভয়েই হঠাৎ উড়ে গেল। সুবোধ তবুও বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাঁশঝাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মা বললেন, "সুবো, তবে একবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে এস, জ্বর তেম্নি আছে, হুঁস হয়নি।"

সুবোধ উঠে চলে গেল। মা আর একবার ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। মাধুরী তেম্নি বসে রইলো। তার দু'জন সঙ্গিনী এল তাকে ডাকতে। সে তাদের ফিরিয়ে দিলে।

বেলা চললো বেড়ে।

সুবোধ ফিরে এসে বললে, "ডাক্তার চরে রোগী দেখতে গেছেন।"

চর থেকে রোগী দেখে তাঁর বাড়ি ফিরতে বেলা প্রায় তিনটে বাজে। বাড়ি এসে স্নানাহার ও বিশ্রামে বেলা যায় গড়িয়ে। তারপর যান ডাক্তারখানায়। রোগীরা যায় সেইখানে।

কাজেই সকলে হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁদের সব বল-ভরসা যেন নদীপারে চরের গ্রামে উড়ে গিয়ে পড়লো।

মা সাধ্যমত ঠাকুর-দেবতার কাছে মানৎ করে। বোনটি দুর্গা ঠাকরুণকে ডাকতে লাগলো মনে মনে।

কিন্তু যার জন্য এত অস্থিরতা ও ভাবনা, সে রয়েছে তেমনি অসাড়। অসাড় থাকলেও তার দেহের মধ্যে চলছিল ঘোর সংগ্রাম—জীবন ও মৃত্যুর। সতীশ ডাক্তারের ঔষধের গুণ ছিল কি না জানি না, তবে রোগী ধীরে ধীরে এক সময় চোখ মেলে বিস্ময়ে একটু তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে। তার পর আবার চোখ মেলে তাকিয়ে একটু পাশে মাথা ফেরাতেই মাধুরী ব্যস্ত হয়ে ডাকলে, "মা, ও মা, শীগগির এস।"

মা ছিলেন উঠোনে। ডাক শুনেই তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে উঠে এলেন।

বাসব আস্তে আস্তে বললে, "মাধু, তুই এখানে বসে কেন?"

সে উত্তর দেবার আগেই মা ঘরে ঢুকে বাসবের দিকে তাকিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার মাথায় শীতল হাতখানি দিয়ে বললেন, "ঘামে কপাল মাথা ভিজে গেছে। কপালটা এখন অনেক ঠাণ্ডা। কেমন আছিস বাসু?" বলে তার চুলগুলোর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করলেন।

বাসব বললে, "আমার কি হয়েছিল?"

—"জ্বর। গায়ে হাত রাখা যাচ্ছিল না। কাল থেকে তুই বেহুঁস হয়ে ছিলি। সতীশ ডাক্তারের ওষুধে তবে তোর জ্ঞান হল—"

আর পাঁচটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো বাসবেরও সতীশ ডাক্তারের ডাক্তারি ও ঔষধের ওপর শ্রদ্ধা ছিল না। চুপ করে রইলো।

মা বললেন, "তুই এবার কিছু খা। মিছরি, দুধ, সাবু—"

বাসব নাক সিঁটকে মাথা নাড়লে।

মা তবুও ছাড়লেন না, চলে গেলেন মিছরি আনতে। খাদ্যসামগ্রী কয়টিকে তিনি সকাল থেকে একে একে সংগ্রহ করেছিলেন।

বাসব বললে, "মাধু, তুই এখানে বসে আছিস কেন?"

মাধু বললে, "তোমার এত জ্বর। তোমাকে একলা ফেলে রাখা কি ঠিক ?"

তার কণ্ঠস্বরে ও কথায় বাসবের কৌতুক বোধ হল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, মাধুর, ছোট্ট মাধুরীর কচি মুখখানিতে বয়স্কের গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

বাসবের জ্বর তখন সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও তার মনের জড়তা দূর হয়ে চিন্তাশক্তি ফিরে এল। বললে, "মাধু তুই যা, খেলা করগে। মা আছে।"

মাধুরী তবুও উঠল না, পাশে মাচা থেকে তার জামাটি পেড়ে নিয়ে সেলাই করতে লাগলো। মা এক ডেলা মিছরি ও এক গেলাস জল হাতে করে ঘরে ঢুকলেন এবং ছেলেকে খাওয়াতে লাগলেন।

বাসব অনিচ্ছায় সেটুকু খেয়ে, একটু সুস্থ হয়ে চুপ করে পড়ে রইলো। মা গেলেন বাকী কাজগুলো সারতে।

নিঝুম দুপুর। কোথায় যেন একটি ঘুঘু ডাকছিল। দূর থেকে ভেসে আসছিল ছেলেদের কল-কোলাহল। বাসব চুপ করে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা পড়ে এসেছে, শরীর অনেকটা সুস্থ। মনে হচ্ছে গায়ে যেন কিছু জোর ফিরে এসেছে, উঠে বসতে—এমন কি হাঁটতেও পারে। সে দেখলে, ঘরে কেউ নেই, কোণে কোণে অন্ধকার জমে উঠেছে, আলো সরে যাচ্ছে। তার মাথার কাছে জানালাটি ছিল আধখোলা। তার ভেতর দিয়ে একটু বাতাস আসছিল। সে উঠে জানালাটি খুলে দিয়েই চমকে উঠলো!

জানলায় ফুটে উঠেছে একখানি মুখ যেন ফ্রেমে আঁটা ছবি।

বাসব উল্লাসে ডাকলে, "অমৃত! তুই কোথা থেকে ?"

অমৃত হেসে বললো, "বাড়ি থেকে একটু আগে কয়েকটা জিনিস কিনতে এসেছি। শুনলাম তোর অসুখ। তাই—"

—"ভেতরে আয়।"

—"যাচ্ছি। কেমন আছিস ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে সরে গেল।

এই জানালাটিতে দাঁড়িয়ে অমৃত কতদিন বাসবকে ডেকেছে।

অমৃত ভেতরে এল। বারান্দায় মাদুরে বসে বাসবের মা আলোর চিমনি পরিষ্কার করছিলেন। অমৃতকে দেখেই বলে উঠলেন, "কি অমৃত, তুমি না বাড়ি গিয়েছিলে ?"

—"হাঁ মাসীমা। আজ এসেছি বারোয়ারির কয়েকটি দরকারী জিনিস কিনতে।"

—"কার সঙ্গে এসেছো ?"

—"একা। জিনিস কটা কিনে বাসবের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম, পথে সুবোধের সঙ্গে দেখা। সে বললে দাদার জ্বর।"

—"তুমি আজই ফিরবে ?"

—"হাঁ। পৌঁছতে একটু রাত হয়ে যাবে।"

—"একাই যাবে !"

—"না গ্রামের আরও দু'জন আছে। তিনজনেরই সাইকেল আছে। চাঁদনী রাত। রাস্তাও শুকনো হয়ে এসেছে। চলে যাবো—" বলে সে বারান্দায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলে, "মাধু, মোহন—এরা গেল কোথায় ? ঠাকুর দেখতে ?"

—"হাঁ।"

অমৃত ঘরে গিয়ে বাসবের কাছে বসে তার কপালে হাত রাখলে।

অমৃত বললে, "তোর জ্বর এখন নেই বললেই হয়।"

বাসব উত্তর দিল না, সে কেবল তার হাতখানি ধরে রইলো। সে একবার তাকিয়ে দেখলে, অমৃতের গায়ে নূতন জামা, পরণে নূতন কাপড়, পায়ে নূতন জুতো।

অমৃত বললে, "পুজোটা তোর গেল এমনি।"

—"না। জ্বর তো কাল বিকেল থেকে হয়েছে। ইয়াকুবদের বাড়ি থেকে নৌকোয় ফিরেছিলাম। দাঁড় টেনেছিলাম রোদে। তারপরই চান করি—"

—"এবার আমাদের গ্রামে খুব বড় মেলা বসেছে। যাত্রা হচ্ছে। বিলে নৌকো এসেছে অনেক। তার মধ্যে খান কতক নৌকো, সেগুলো ছিপ নয়, ছিপের মতো দেখতে, নানা রঙের নিশান দিয়ে সাজানো। নৌকো ক'খানা যখন চলে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জলের ওপর দিয়ে মালা উড়ে যাচ্ছে। যদি যেতিস কি আনন্দ হত! কিন্তু জ্বর বাধিয়ে বস্‌লি!"

—"জ্বর সারলেই যাবো।"

—"পরশুদিন রাঘব ভুঁইমালি বর্শা দিয়ে একটা দাঁতালো শূয়র মেরেছিল। ওই শূয়রটা দিন কতক ধরে নাকি ভারী উৎপাত করছিল। রাঘব গিয়েছিল

তার ক্ষেতে। হাতে ছিল বর্শা। সে উঠেছিল টঙে। শূয়রটা যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। যেমন দেখা তেমনি মার। এখনও রাস্তায় শূয়রের ভয় আছে।”

—“তবে তোরা রাত্তিরে যাবি কি করে?”

—“এখন পুজোর সময় পথে একটু রাত অবধি লোক চলাচল করে, গরুর গাড়িও যায়। আর আমরা তো যাবো সাইকেলে। তুই ভাল থাকলে আজকে খুব মজা করা যেত।”

বাসব নিঃশ্বাস ফেললে; তারপর বললে, “ভাল আমি হবই—যাবও শীগ্‌গির। তখন দেখিস—”

—“আচ্ছা, আজ চললাম।”

—“তোর সাইকেল কোথায়?”

—“বাড়িতে। আমার সঙ্গীরা হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে। না এসে থাকলে আমাকেই যেতে হবে তাদের কাছে।”

—“মাণিকদার খবর শুনেছিস? তাকে পুলিশে গ্রেফতার করেছে।”

—“কেন?”

—“জানি না।”

অমৃত বেরিয়ে গেল।

বাসব শুয়ে শুয়ে খোলা জানালাটা দিয়ে শরতের কোমল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশের গা থেকে একটু একটু করে আলো মিলিয়ে আসছে। একটি পাখি উড়ে গেল। তখন মনে হল, আকাশখানা কি নির্জন! ওই একখানা সাদা মেঘ উঁকি দিচ্ছে।

দিনের আলো মিলাতে না মিলাতে ছড়িয়ে পড়লো নবমীর চাঁদের আলো; ফুটলো তারা। মা ঘরে আলো দিয়ে গেলেন। বাসবের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, গা আরও ঠাণ্ডা। তিনি বেরিয়ে গেলেন সংসারের কাজে।

কথা ছিল সুবোধ সন্ধ্যায় ডাক্তারখানায় গিয়ে ডাক্তারবাবুকে রোগীর সংবাদ দিয়ে আসবে। বাসব শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো অমৃতের কথা।

দশমীও কেটে গেল রোগশয্যায়। নদীর ধারে বাড়ি। দশমীর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে বিসর্জনের বাজনা শুনলে। সানাই যেন কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যার আকাশে বিদায়বাণী ছড়িয়ে দিতে লাগলো। এবারের মতো উৎসব হল শেষ! আবার বর্ষান্তে শরতের সাদা কাশের মেলায়, পদ্মের বনে বনে, আকাশের নীল পাথারে রাজহাঁসের মতো সাদা মেঘের দলে বাজবে বাংলার,

বাঙালির সেরা উৎসবের আগমনীর সুর। কোমল কচি ঘাসের মাথায় হীরের গুঁড়ো যাবে ছড়িয়ে, অমল জলের কোমল বুকে গলা সোনার মতো আলো পড়বে ঝরে, কেয়াবনের গন্ধ উড়বে বাতাসে।

বাসব দীর্ঘ নিঃশ্বাসে উৎসবের শেষ দিনটিকে দিনান্তে বিদায় দিলে। সে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো। তার মাথায় ঘুরতে লাগলো এলোমেলো ভাবনা।

চৌদ্দ

বাসব একদিন বললে, "মা, কাল আমি যাবো অমৃতদের গাঁয়ে।"

মা বললেন, "সে কি? এই সেদিন অমন অসুখ থেকে উঠলি! সেখানে গিয়ে যদি আবার কিছু হয়?"

—"আর কিচ্ছু হবে না। আমি সেখানে দু'দিনের বেশি থাকবো না। তোমার কোন ভয় নেই।"

—"ভরসাই বা কি? পাড়া-গাঁ। সেখানে কত রকম কি হতে পারে।"

—"সেখানেও তো মানুষ আছে।"

—"তাদের কথা আলাদা। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই।"

বাসব কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মা আবার বললেন, "গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু নিষেধটা জোর করে করতে পারলেন না।

বাসব বললে, "আমি হেঁটে যাবো।"

—"এত পথ হেঁটে যাবি?"

—"কত লোক যাচ্ছে, আসছে। আমার মতো ছেলেরাও যায়। কেন পারবো না?"

—"তুই কি পথ চিনিস্?"

বাসব একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। তারপর বললে, "তুমি সে পথ দেখনি তাই ভয় পাচ্ছো। একেবারে সোজা সড়ক, কাণাও যেতে পারে।"

—"ওদের গাঁয়ের নাম যেন কি?

—"হরিশঙ্করপুর। মস্ত বিল আছে সেখানে, অমৃতদের বাড়ি থেকে বিলটা হবে সিকি মাইল। বিলে কত মাছ! আমি সেবার ছিপে একটা মাছ গেঁথেছিলাম। মস্ত মাছ সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। এবারও মাছ ধরবো। বড় মাছ হলে এখানে নিয়ে আসবো—"

সুবোধ এসে দাঁড়িয়েছিল পিছনে। সে শুনেছিল শেষের কথাগুলি। বললে, "দাদা, আমিও যাবো মাছ ধরতে।"

বাসব হেসে উঠলো।

সুবোধ বললে, "আমাকেও নিয়ে চল।"

বাসব বললে, "আচ্ছা, গরমের ছুটির সময় আবার যখন যাব তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

কিন্তু ভবিষ্যতের আনন্দের প্রতি সুবোধের লোভ ছিল না, তাই সে বায়না ধরলো। বাসব বললে, "যদি পারি তোর জন্যে একটা হল্‌দে পাখি ধরে আনবো।"

—"যদি না পার?"

—"একটা কিছু আনবই। হয়তো সেটা হবে হলদে পাখির চেয়ে আরও ভাল।"

সুবোধ এ কথাতেই শান্ত হল।

বাসব পরদিন ভোরে উঠলো। মা তত সকালেই তার জন্যে ফেনে ভাতে রান্না করে দিলেন। সে যখন রওনা হল তখন সুবোধ ও তার ছোট ভাইটি ঘুমোচ্ছে। মা ও মাধু দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

তখন রোদ ওঠেনি, গাছের পাতায় পাতায় শিশির মাখানো রয়েছে। পথে পথিক চলছে দুটি একটি, একখানি গরুর গাড়ি আসছে মন্থরগতিতে।

বাসব শহর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লো বাইরে গ্রামের পথে। পথের দু'পাশে ধান ক্ষেত। মঞ্জরীগুলি ফল ও শিশিরের ভারে নুয়ে পড়েছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমে আছে। পাশের গ্রাম থেকে চাষীরা দু'একজন এসে ক্ষেতের এখানে সেখানে কি যেন করছে। বোধ হয় জল চলাচলের পথ কেটে দিচ্ছে। একটা জলায় রয়েছে পদ্মবন; আর এক জায়গায় শালুকের ঝাড়। একটি স্ত্রীলোক জলার তীরে দাঁড়িয়ে আঁকশি দিয়ে শালুকের ডাঁটা ও ফুল তুলছে, বোধ হয় রান্না করে খাবে। তার পাশে একটি ছোট, রোগা কালো, উলঙ্গ মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বোধ হয় ক্ষুধায়।

বাসব দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে। সামনে দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার ডালে ডালে সাদা ও বড় বড় ফুল ফুটে আছে। সে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের মনে হেসে উঠলো। সেগুলো ফুল নয় সাদা বক।

ততক্ষণে সবুজে, হলুদে, সাদায়, নীলে আঁকা ছবিগুলি রোদে ঝলমল করছে। পাখি ডাকছে। ঝির ঝির শব্দে ক্ষেতের জল বয়ে চলেছে। কিন্তু পথ



প্রায় পথিকহীন। সে পিছন ফিরে দেখলে কেউ আসছে না, সামনেও কেউ নেই। তবে হঠাৎ একবার টিং টিং আওয়াজ হল। তাতে সে বুঝলে সাইকেল আসছে। একটু পরেই পথের বাঁক থেকে তার সামনে দিয়ে সাইকেল আরোহী বেরিয়ে এলো। বাসবের দিকে সকৌতূহলে তাকাতে তাকাতে চলে গেলো।

বাসবও মোড় ঘুরে দেখলে, একটি গ্রামের লোক দুটি রোগা পাঁঠা নিয়ে আসছে, বোধ হয় শহরের হাটে বেচতে। লোকটির এক হাতে পাতাশুদ্ধ একটি কাঁঠালের ডাল, আর হাতে একগাছি সরু ও ছোট খেজুর-ছড়ি। যে হাতে কাঁঠালের ডাল সেই হাতেই সে পাঁঠা দুটির দড়ি ধরে আছে। সামনে কালীপূজো। পাঁঠা দুটি পাতার লোভে লোভে খুট খুট করে ছুটতে ছুটতে আসছে। তারা বুঝতেই পারছে না, তারা হাড়কাঠের দরজা পেরলেই তাদের জন্যে রয়েছে স্বর্গ।

বাসবের কেমন হাসি পেল। সেবার অমৃতদের গ্রামে লাহিড়ীদের বাড়ির

পুজোয় সে দেখেছিল পাঁঠা ও মহিষ বলি। হাঁ, বলি বটে! তাজা গরম রক্তে বলির জায়গাটায় কাদা হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কাদায় সকলে নৃত্য করেছিল, গড়াগড়ি দিয়েছিল।

বেলা যত বাড়তে লাগলো লোকের ও গরুর গাড়ি আনাগোনা হতে লাগলো ততই বেশি। সেদিন শহরে হাট বলে অন্য দিনের চেয়ে পণ্য নিয়ে লোকজন ও গরুর গাড়ির আনাগোনা দেখা যেতে লাগলো বেশি করে।

ঠিক দু' ক্রোশের মাথায় ছিল একখানি ছোট গ্রাম। নাম মোহনপুর। মোহনপুরের পাশে একটি প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় ছিল একখানি ছোট ময়রার দোকান। তাতে জিলিপি, চিনির জোড়া মণ্ডা, মেঠাই, কখন সখন রসগোল্লা বা চম্‌চম্ তৈরি হত। আর পাওয়া যেত ছোট বড় বাতাসা, খাগড়াই, মুড়ি, দিয়াশলাই, বিড়ি, তামাক ও পান। মিষ্টিগুলিতে সর্বদাই বসে থাকতো বোলতা, দুটি-চারটি মৌমাছি ও গুবরে মাছি। তারা সকলেই মিষ্টির রসে ফুলে এমন অলস হয়ে পড়েছিল যে কামড়ান তো দূরের কথা একটি থেকে আর একটিতে উড়ে গিয়ে বসতেও তাদের কষ্ট হত, তবে তামাকের খদ্দেরটা ছিল রোজই ভোর থেকে রাত দশটা অবধি। দোকানখানি টিনের। সামনে খান দুই খেজুর গুঁড়ির বেঞ্চি পাতা ছিল। ঘরের কোণে মালসায় থাকতো আগুন। গাড়োয়ানরা অনেকেই সেই আগুনে নারকেলের ছোবড়ার নুড়ি বা টিকেখানা ধরিয়ে নিয়ে কলকের মাথায় চড়িয়ে ফুঁ দিতে দিতে চলে যেত।

রোদে চলতে বাসবের তৃষ্ণা বোধ হল। সে সেবার অমৃতদের সঙ্গে যাওয়া-আসার সময় দোকানখানা দেখেছিল। গ্রামের নাম ভুলে গেলেও দোকানখানার ছবি সে ভুলতে পারেনি। যাবার পথে দেখেছিল দোকানের বেঞ্চির ওপর বসে এক বুড়ো বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। ময়রা তখন বাতাসা কাটছিল।

দোকানখানা ছিল সামনেই, বাসব দেখলে একটি লোক বেঞ্চিতে বসে তামাক খাচ্ছে।

বাসব গিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াতেই ময়রা ও হুঁকো-হাতে লোকটি তার দিকে সকৌতূহলে তাকালো।

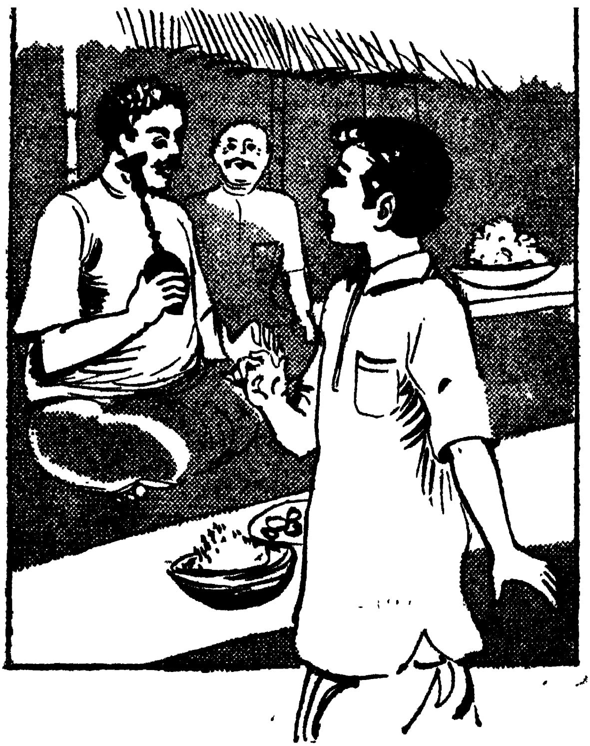
বাসব বললে, "এক গেলাস জল দেবে?"

ময়রার পো উঠে একটি পেতলের পাতলা গেলাসে মেটে কলসী থেকে জল

গড়িয়ে তাকে জল দিলে। গেলাসটা তেল হড়হড়ে, বোটকা গন্ধভরা। জল-টুকুর রঙ ঘোলা, ওপরে তেল ভাসছে। তারপর সে লোকটিকে বললে, "সতীশ ডাক্তারও কিছু করতে পারলে না?"

—"ডাক্তার ডাকবার সময় পেল কই? রাতে জ্বর হল, ছেলেটা সকালে মরে গেল। ছেলেটা ছিল ভারী ভাল। শহরের ইস্কুলে পড়তো। বিহারীদা তো একেবারে ভেঙে পড়েছে।"

বাসবের কান দুটো খুব সজাগ হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি জলটুকু খেয়ে গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে দোকানের মেঝেতে রাখতে রাখতে আবার শুনতে পেল "কে জানতো এমন হবে? বুড়ো বয়সে—"



ময়রা বললে, "এই তো নবমীর দিন সাইকেলে শহরে যাচ্ছিল। যাবার পথে এখানে নামলো। বসে খাবার খেলে। ছেলেটার কথাবার্তা ছিল ভাল।"

এবার বাসবের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো, সে আর দাঁড়াতে পারলো না, পাশের বেঞ্চিতে বসে পড়লো।

সেই লোকটি তার দিকে তেম্নি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার বাড়ি কোথায় গো?"

—"শহরে।"

—"এদিকে কোথায় এসেছ?"

বাসবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "বেড়াতে।"

—"বেড়াতে? তোমায় আমি যেন কোথায় দেখেছি। তুমি অমৃতের বন্ধু না?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাই চেনা-চেনা ঠেক্‌ছে। শুনেছ, তোমার বন্ধু পরশু একদিনের জ্বরে মারা গেছে।"

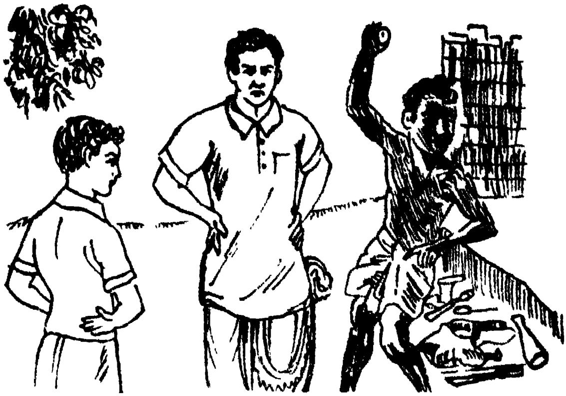
বাসব শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার মনে উঠতে লাগলো নানা কথা। প্রখর রোদে যে তার মাথা ও পিঠ পুড়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালই রইলো না। তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো।

তারপর এক সময় উঠে সে ফিরে চলতে লাগলো বাড়ির দিকে। কিন্তু পথটাকে তার বোধ হতে লাগলো দীর্ঘ, কষ্টকর ও নিঃসঙ্গ। বাড়িও যেন বহুদূরে। সেখানে পৌঁছতে আরও কত কি ঘটবে কে বলে দেবে!



নাটক



জন্মদিন

প্রথম দৃশ্য

[শহর। বড় রাস্তার ধারে একখানি বড় বাড়ি। তার সামনে লন ও ফুলের বাগান। একটু বেলা উঠেছে। সোনালি রোদে সব মাখামাখি। ছেলেদের পড়ার ঘর। তার খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে রোদ এসেছে ; বাইরের সোনা-মাখা দৃশ্যেরও খানিকটা চোখে পড়ছে। ওপরে কোথায় যেন অরগ্যানে প্রভাতী সুর বাজছে। তার অস্পষ্ট মিষ্ট ধ্বনি চারধারে ঝরে পড়ছে ; ঘরের ভেতরেও রোদ ঢুকছে।]

উৎপল। (বারো-তেরো বছরের ছেলে। ঘরের এক ধারে 'গান-র‍্যাক' থেকে এয়ার-গানটা পেড়ে নিতে নিতে খোলা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে) রঘু—রোঘো—এই রোঘ্—

রঘু। (কিশোর। দরজা দিয়ে ঝাড়ন হাতে ঢুক্‌তে ঢুকতে) কি ?

উৎপল। কের আমার বন্দুকে হাত দিয়েছিলি ?

রঘু। কিসে ? কোন্‌টেতে ?

উৎপল। কোন্‌টেতে ? জানো না ! (রঘুর বুকের দিকে গানটা বাগিয়ে ধরে) এইটেতে ! কেন হাত দিয়েছিলি, বল্‌ ? এখনই গুলি করবো। বল্‌ ?

রঘু। (কতকটা কৃত্রিম ভয়ে) ঠাকুর আমার ভাতের সাথে রোজ মাছ রাখে আর ও-বাড়ীর হুলোটা এসে খেয়ে যায়। সেটাকে গুলি করে মারবো বলে ওটায় হাত দিয়েছিলাম।

উৎপল। ঠাকুর তোমার জন্যে মাছ রাখে না ঘোড়ার ডিম রাখে। ও নিজে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দেয়। খবরদার বলছি, আর যদি কখন—

নীলা। (চোদ্দো বছরের বেশি নয়। এক গোছা ফুল হাতে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে) ওমা, ও কি হচ্ছে? রঘুকে গুলি করে মারা হবে?

উৎপল। হ্যাঁ হবে! তুমি জানো।

নীলা। (ফুলগুলো টেবিলের উপর রাখতে রাখতে) তবে ও কি হচ্ছে?

উৎপল। এয়ারগানের গুলিতে একটা কাকই মরে না তো রোঘো। আমি ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। রোজ আমার এয়ারগানটা পেড়ে নেয়। ফের যদি - যাও—ভূত।

[রঘুর প্রস্থান

নীলা। ওঃ! বাবুর কি মেজাজ। আজ সকাল থেকেই—

উৎপল। আজ আমার জন্মদিন। আমার যা খুশি তাই করবো।

নীলা। (চেয়ারে বসতে বসতে) করবেন বৈ কি। রাজারও তো জন্মদিন হয়। রাজা বুঝি সেদিন সকাল থেকেই লোকের মাথা কাটতে শুরু করে?

উৎপল। রাজার কথা আলাদা।

নীলা। কেন? রাজাও তো মানুষ।

উৎপল। ওঃ! মেয়ের আর কিছু নেই, কেবল আছে লোকের সঙ্গে তর্ক।

নীলা। দোষ দেখালেই হয় তর্ক।

উৎপল। (এয়ারগানটা কাঁধে ফেলে নীলার সামনে 'মার্চ' করতে করতে) দোষ দেখাবার অন্য লোক আছে।

নীলা। আমি তোমার দিদি।

উৎপল। (থমকে দাঁড়িয়ে নীলার মুখের সামনে হাত নেড়ে) আজকাল ছোট ভাইয়েরা দিদিদের আর মানে না, মশায়।

নীলা। মানে কি না বাবাকে জিজ্ঞেস করবো।

উৎপল। বাবাকে কি জিজ্ঞেস করবে? পিসিমা তো বাবার দিদি। বাবা পিসিমার কথা শোনে?

[নেপথ্যে—উৎপল—উৎপল!

নীলা। ঐ তোমার বন্ধুরা সব আসছে।

উৎপল। (জানালার কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) অরুণ! এই অরুণ!

নীলা। (চেয়ার থেকে উঠে) চল্লাম।

উৎপল। (তার দিকে ফিরে) দিদি, আমার জন্মদিনে তুমি কিছু দেবে না?

নীলা। (মুখের সামনে হাত নেড়ে) আজকালকার দিদিরাও ছোটভাইদের জন্মদিনে কিছু আর দেয় না, মশায়।

[প্রস্থান

অরুণ। (হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে) বলাই আসে নি?—বলাই?

উৎপল। না। তুই হাঁপাচ্ছিস্ কেন?

অরুণ। (তেমনই হাঁপাতে হাঁপাতে) একটা চার-পাচ বছরের ছেলে তোদের মটরে চাপা পড়েছে।

উৎপল। কাদের ছেলে? আমাদের ড্রাইভারকে ধরেছে?

অরুণ। ছেলেটি বোধ হয় রাস্তার। ওর জন্যে কেউই তো কাঁদছে না।

উৎপল। আমাদের গাড়িখানাকে রাস্তার লোকেরা ঘিরে ধরেছে?—ধরে নি? সেবার বড়দা বস্তির একটা ছোটলোকের ছেলেকে চাপা দিয়েছিল। ছেলেটা এক ঠোঙা বেগুনি কিনে ছুটে রাস্তা পার হচ্ছিল। ব্যস! মার্ড-গার্ডের এক ধাক্কায় সে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো ফুটপাথের ওপর। বড়দা থামাতেই রাস্তার আর ফুটপাথের লোকেরা মারতে এল। ধম্ ধম্ করে গাড়িখানার গায়ে লাথি লাগাতে লাগলো। এমন সব বদমায়েস!

বলাই। (বেগে ঘরে ঢুকে) এই উৎপল! এই! তোদের বাসন-মাজা ঝিয়ের ছেলেটাকে ঐ মোড়ের লালবাড়ির ছোটবাবু মটর চাপা দিয়েছে। ছেলেটা রাস্তার মোড়ে পড়ে আছে। কি রক্ত!

উৎপল! (উত্তেজিত হয়ে) অরুণ, তুই যে বল্লি আমাদের ড্রাইভার চাপা দিয়েছে! চল্—শিগ্‌গির চল্। ওদের ছোটবাবু র‍্যাস্‌কেলটাকে আমার বুলডগ দিয়ে খাওয়াবো। আমাদের ঝিয়ের—

[বেগে প্রস্থান। তার পিছনে বলাইয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে একবার ঝিয়ের হাহাকার উঠলো, তারপরই মিলিয়ে গেল।]

নীলা। (ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে) অরুণ! অরুণ! তুমি দেখে এসেছ আমাদের বাসন-মাজা ঝিয়ের ছেলে চাপা পড়েছে?

অরুণ। আমি শুনেছি একটি ছেলে। কার তা জানি না। যে ভিড়! বলাই দেখেছে।

নীলা। আহা! ওরা বড় গরিব। সেদিন ঝিটা মায়ের কাছে বলছিল, 'ঐ ছেলেটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই মা।'

অরুণ। আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জান, নীলাদি? যেথানে যত মটর গাড়ি আছে সব ভেঙে চুরমার করে ফেলি। একজন আরাম করবে, আর তার জন্যে মরবে আর একজন?

নীলা। শোন কথা! কেবল কি আরামের জন্যেই লোকে মটর চড়ে? মটর গাড়ির দরকার কত!

অরুণ। কিন্তু মানুষের জন্যেই তো মটর গাড়ি। তার চেয়েও দরকারী মানুষের জীবন। ও ছেলেটা কেন মরবে?—কেন?

[দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বলাইয়ের বাড়ির সম্মুখ। দরজায় দাঁড়িয়ে তার ছোট ভাই পিণ্টু লাটিমে লেত্তি জড়াচ্ছে আর গুন গুন করে গান গাইছে।]

ছোট্টু। (কিশোর মুচি। পথ দিয়ে হেঁকে চলেছে) বুরুষ! সেলাই বুরুষ!

পিণ্টু। (আট নয় বছরের বেশি নয়) এই বুরুষ দাঁড়াও। (দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে) দাদা! মুচি এসেছে।

[ভেতর থেকে অস্পষ্ট উত্তর এল]

পিণ্টু। দাঁড়াতে বলবো? এই দাঁড়া। (লাটিমটা রাস্তায় ঘুরিয়ে) তোর নাম কি রে?

ছোট্টু। ছোট্টুলাল।

পিণ্টু। তুই লাট্টু ঘোরাতে জানিস?

ছোট্টু। (সহাস্যে) হুঁ!

পিণ্টু। ঘোরাস না?

ছোট্টু। হামার বাপ বকে।

পিণ্টু। কেন? কেন তোর বাপ বকে?

ছোট্টু। (রোয়াকের ওপর থলি ও নেহাইটা রেখে) কাম না করলে খাবে কি? গরীব লোক।

পিণ্টু। তোর বাপ কাজ করে না?

ছোট্টু। হঁ।

পিণ্টু। (লাটিমটা মাটি থেকে তুলে নিতে নিতে) এখানে তো তোর বাপ নেই। আমার এই বাটিয়ালটা ঘোরা দেখি!

[পকেট থেকে একটা বড় লাটিম ও একগাছি লেত্তি বার করে ছোট্টুর হাতে দিল।]

(ছোট্টু সহাস্যে লাটিম ও লেত্তিটা পিণ্টুর হাত থেকে নিয়ে লাটিমটার গায়ে লেত্তি জড়াতে জড়াতে মাথা দোলাতে লাগল।)

[এক জোড়া কালো জুতা হাতে বলাইয়ের প্রবেশ]

বলাই। বাঃ! মুচির সঙ্গে লাট্টু ঘোরান হচ্ছে? যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে খেলা? কার লাট্টু ওটা?

পিণ্টু। আমার। ওকে ঘোরাতে দিয়েছি।

বলাই। দাঁড়াও বাবাকে বলে দিচ্ছি। তোমার গুণ বাড়ছে।

পিণ্টু। খেললুম তো কি হল? ছোটলোকেরা কি মানুষ নয়? আমাদের বইয়ে আছে, 'কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই।' তাই আমি ঘৃণা করছি না, ওর সঙ্গে ভাব করে খেলছি।

বলাই। ফের কথা? (ছোট্টুর দিকে ফিরে) এই তুই ওর লাট্টু ঘোরাচ্ছিস্ যে বড়!

[ছোট্টু লাটিম ও লেত্তিটা রোয়াকের ওপর রেখে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে প্রস্থানোদ্যত।]

বলাই। যাচ্ছিস্ কোথায়? জুতো জোড়া রঙ করে দে।

ছোট্টু। হামার কাছে কালো রঙ নেই আছে।

বলাই। তবে এতক্ষণ কি করছিলি? উল্লুক!

[ছোট্টুর নীরবে প্রস্থান। দূর থেকে আবার তার হাঁক শোনা যেতে লাগল। শব্দটা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ 'অ্যানটি এয়ার ক্র্যাফটের' পর পর কতকগুলো শব্দ হল। সেই সঙ্গে শোনা যেতে লাগল প্লেনের ইঞ্জিনের হুঙ্কার।]

পিণ্টু। দাদা, এখনই সাইরেন বাজবে। ঐ—ঐ যে বাজছে সাইরেন!

বলাই। (কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে) যাঃ! ও রেলগাড়ির হুইস্‌ল। তুই ভারি ভীতু।

পিণ্টু। তাই সেদিন রাতে যখন বোমা পড়ছিল তুমি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলে!

বলাই। আর তুমি মায়ের কোলের ভেতর—

পিণ্টু। ঐ অরুণদা আসছে। অরুণদা!

[ব্যস্ত হয়ে অরুণের প্রবেশ]

অরুণ। তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? তৈরি হয়ে নে।

বলাই। (উদাসীনের মত) গিয়ে কি হবে? আমার ভাল লাগছে না। গ্রাম আমি দেখেছি। আমাদের মামার বাড়ি ফুলডাঙায়। সেখানে আছে মস্ত এক দীঘি। তার চারধারে বড় বড় তালগাছ। সেই তালগাছগুলোর আড়ালে ডাকাত লুকিয়ে থাকতো। পথ দিয়ে কেউ গেলেই তাকে দু'খানা করে কেটে ফেলে—

পিণ্টু। সেবার আমার বড় মামাকে—

বলাই। যাঃ। তাদের চাকরকে—

পিণ্টু। বড় মামাকে—

বলাই। চাকরকে—

পিণ্টু। বড়—

বলাই। (পিণ্টুর মুখে হাত চাপা দিয়ে) দু'খানা করে কেটে ফেলে—

অরুণ। উৎপলদের গ্রামে দীঘিও নেই, ডাকাতও নেই। আছে নদী, মাঠ, জঙ্গল, পুকুর, ভাঙামন্দির। সেবার গিয়ে আমি দেখে এসেছি।

বলাই। তবে যাচ্ছিস কেন?

অরুণ। বেশ বেড়ানো হবে। তাছাড়া উৎপল এতো করে বলেছে—

বলাই। এই পিণ্টু তুই ভিতরে যা।

পিণ্টু। আমি জানি কেন তুমি যাবে না।

বলাই। চোপ!

পিণ্টু। হ্যাঁ, বলবো।

বলাই। মার খাবি পিণ্টু।

পিণ্টু। বললামই বা! জানো অরুণ দা—

বলাই। এই!

পিণ্টু। (দরজায় ঢুকে) বাবা ওকে বড়লোকদের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে। বলেছে, ওদের জাতই আলাদা। গরীবদের সঙ্গে কিছুতেই ওদের মিশ খায় না।

(বলাই হাতবাড়িয়ে পিন্টুকে ধরতে গেল। পিন্টুর বেগে প্রস্থান)

অরুণ। সত্যি ?

(বলাই নিরুত্তর)

অরুণ। মিশলে কি হয় ?

বলাই। অরুণ, প্রতিজ্ঞা করছি, আমি খুব বড়লোক হব।

অরুণ। কিন্তু ভাই, আমি বড়লোক হতে চাই না।

বলাই। কেন ?

অরুণ। পাঁচজনকে ছোট করেই তবে বড়লোক হওয়া যায়। আমি হতে চাই এমন লোক, যাতে সকলকে সাহায্য করতে পারি, সকলের কাজে লাগি. সকলের সঙ্গে মিশতে পারি।

বলাই। বড়লোক না হলে তুমি লোককে সাহায্য করবে কি করে শুনি ?

অরুণ। আচ্ছা, বুদ্ধ কি বড়লোক ছিলেন ? লেনিন কি বড় লোক ? স্টালিন তো চাষার ছেলে। আর গান্ধী !—গান্ধী কি ?

বলাই। ঠিক ! বিদ্যাসাগরও তো বড়লোক ছিলেন না। আচ্ছা, এমন যদি হ'ত কেউ বড়লোক নয়, কেউ কাউকে ছোট করে না, কিম্বা সকলেই বড়লোক।

অরুণ। তাহলে সকলেই উৎপলদের মতো আরামে থাকতো। চল, উৎপলকে গিয়ে বলে আসি আমরা যাবো না।

বলাই। চল্। তার জন্মদিন। আমরা গরিবের ছেলে। আমরা তাতে আনন্দ করবো কেন ?

অরুণ। নিশ্চয়। (উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(উৎপলদের বৈঠকখানা। ভেতরে গ্রামোফোন বাজছে। শিকারীর পোষাকে উৎপল দরজায় দাঁড়িয়ে। পিঠে স্লিংয়ে এয়ারগান বাঁধা। সে একবার বাইরে যাচ্ছে, একবার ভেতরে আসছে।)

উৎপল। (হাতের সোনার রিস্টওয়াচটা দেখে) ওরা এখনও এল না ? বেলা এগারোটা বাজে। কখন তবে যাবে ? ঐ যে আসছে। যেন হাঁটতেই পারছেন না। এই শিগগির

(ধীরে অরুণ ও বলাইয়ের প্রবেশ)

উৎপল। রেডি? এই পোষাকে যাবি?

অরুণ। যাব না।

উৎপল। কেন?

অরুণ। ভাল লাগছে না।

উৎপল। বাঃ! আমি মাকে বাবাকে বলেছি তোরা যাবি। চল্।

(বলাই ও অরুণ নিরুত্তর)

উৎপল। কেন যাবি না? তোরা আমার বন্ধু। আমি তোদের নেমন্তন্ন করেছি। সেখানে শিকার করবো; নৌকায় চড়বো; আমি মটোর হাঁকাবো; খুব মজা হবে। আজ আমার জন্মদিন। এখানে ফিরে এলে বাড়িতেই হবে সিনেমা—পিটারপ্যান! গান হবে, ম্যাজিক হবে। কত লোক আসবে। বাবা অনেককে নেমন্তন্ন করেছেন। দিদির ইস্কুলের বন্ধুরাও আসবে। যা—যা—কাপড় ছেড়ে আয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। না—চল্, আমি তোদের মটোরে নিয়ে যাচ্ছি।

বলাই। বাবা যেতে দেবেন না। তিনি বলেন—

উৎপল। সেখানে কিছুর ভয় নেই। তোর বাবাকে আমি বলছি গিয়ে অরুণ তুই?

অরুণ। আমি? আমাকে কেউ বারণ করেনি। তবে ও যদি যায় আমিও যাব।

উৎপল। (চীৎকার করে) বাবুলাল—এই বাবুলাল, ড্রাইভারকো গাড়ি বাহার করনে বোলো। আমার ক্যামেরাটাও নেব। ছবি তুলবো—তোদের···আমার। ঐ গাড়ি আসছে। (হাত ধরে) চল্ চল্।

(তিনজনের প্রস্থান। অপরদিক থেকে নীলার বেগে প্রবেশ। তার পিছন পিছন এল সুষমা ও লিলি। সকলেই সজ্জিত।)

নীলা। (দরজার কাছে যেতে যেতে) উৎপল! উৎপল! বাঃ আমরা যাব না? এই দ্বারোয়ান, দাদাবাবু চলে গেল?

দ্বারোয়ান। (নেপথ্যে) না; বললেন কি, এখনই আসবেন।

নীলা। কোথায় গেল?

দ্বারোয়ান। জানি না।

নীলা। নিশ্চয়, আরও জনকতক সঙ্গী জোটাতে গেলেন। একখানা গাড়িতে কতজন ধরবে? বাবুর সব তাতে বাড়াবাড়ি। আয় ভাই, আমরা ততক্ষণ বসি :

(তিন জনের একখানি সোফায় উপবেশন)

নীলা। সুষি, তুই একটা গান গা।

লিলি। আর তুই নাচ।

নীলা। আর তুমি বুঝি বসে বসে দেখবে? সে হচ্ছে না। তিনজনেই নাচি গাই। সেই নতুন গানখানা—

গান

হে আলোক, তব সোনার পরশে
গগন উজলি উঠে
জাগে কলগান, ফোটে ফুল ভার,
গন্ধ ব্যাকুলি ছুটে।
রজনীর যত জড়তা আঁধার
ছেদ করি তব খর তরবার
খুলি দিল এক নূতন দুয়ার
সবার চক্ষুপুটে।
দেখা যায় ওই বিজয়ের পথ
তারি মাঝে দিয়ে চলে জয়রথ
সোনার তোরণে বাজে নহবৎ
বন্ধন যায় টুটে।
হে আলোকে তব সোনার পরশে
হৃদয় উজলি উঠে
জাগে নব প্রাণ, নব আশা জাগে
নবীন জীবন ফুটে।

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। বাঃ। এখানে দিব্যি গান লাগিয়েছে, আর আমি তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নীলা। রাস্তায় রাস্তায়? কোথায় যাওয়া হয়েছিল বাবুর?

উৎপল। বলাইকে ডাকতে।

নীলা। যাকে ডাকতে যাওয়া হয় সে বুঝি ডাকবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে থাকে? আমরাও যে যাব সে কথা মনে ছিল না?

উৎপল। তোমাদেরও তো ডাকতে এসেছি।

(চারজনেই হেসে উঠলো)

উৎপল। চল—ওহোঃ—দাঁড়াও—না, তোমরা গাড়িতে গিয়ে ওঠো, আমি এখুনি আসছি। (বেগে প্রস্থান

নীলা। মজার ছেলে! চল্ ভাই, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।

(নীলা, সুষমা ও লিলি প্রস্থানোদ্যত। সঙ্গে সঙ্গেই একটি কুকুর ও একটি ট্রামপেট নিয়ে উৎপলের পুনঃ প্রবেশ।)

উৎপল। কি? তোমরা এখনও যাও নি?

নীলা। কুকুরটা কি হবে?

উৎপল। আমার সঙ্গে শিকারে যাবে। আয় সুইফ্‌ট।

(ট্রামপেট বাদন ও সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম। সন্ধ্যা নেমেছে। একটা গাছে পাখির ঝাঁক ডাকছে। দূরে কোথায় যেন বাঁশের বাঁশি বাজছে। চারধারে জঙ্গল। জোনাকি উড়ছে; ঝিঁঝি ডাকছে। (উৎপল, বলাই অরুণ ও পিণ্টুর প্রবেশ। সঙ্গে সুইফ্‌ট। বলাই ও অরুণের হাতে তীর-ধনুক; পিণ্টুর হাতে টিনের তলোয়ার।)

উৎপল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারধারে বন। কেউ কোথাও নেই। এ কোথায় এসে পড়লাম? কি করে ফিরে যাবো বল তো?

বলাই। সঙ্গে কুকুর আছে। ওই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

অরুণ। ও নিজেই পথ ভুলে গেছে তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তখনই যদি ফিরতাম, তাহলে—

বলাই। ফেরাই হতো, গ্রামখানা আর দেখা হতো না।

পিণ্টু। দাদা, আমি আর চলতে পারছি না। আমার বড় ভয় করছে।

বলাই। তুই কেন এলি? তখন কত করে বারণ করলাম। এখন কি হবে বল তো?

অরুণ। যদি এখন বাঘ আসে ?

পিণ্টু। উৎপলদার বন্দুক আছে।

বলাই। ওর গুলিতে সেই চড়ুইটাই মরলো না, তো বাঘ !

উৎপল। চুপ, চুপ, ঐ বাঁশির শব্দ শোন, নিশ্চয়ই কাছে কেউ আছে। চল সকলে শব্দটা লক্ষ্য করে যাই।

অরুণ। শব্দটা আসছে ওই দিক থেকে।

বলাই। না, এই দিক থেকে।

পিণ্টু। না দাদা, এই দিক থেকে।

উৎপল। একটু কান পেতে শোন। পিণ্টুই ঠিক বলেছে, এই দিক থেকে। চল। না, দাঁড়া। ঐ যে ছায়ার মতো কে এগিয়ে আসছে।

পিণ্টু। (তাড়াতাড়ি বলাইয়ের হাত ধরলো) দাদা ভূত !

অরুণ ও বলাই। (ঢোক গিলে) অ্যা—না—ভূ—(কুকুরটা ডেকে উঠলো)

(উৎপল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে)

(মহীন্দ্রের প্রবেশ। গায়ে ময়লা কাপড় জড়ানো। হাতে একটি এনামেলের বাটি। মহীন্দ্র পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।)

উৎপল। (এগিয়ে গিয়ে) এই শোন। 'পল্লীবাস' বাড়িখানা কোথায় জানো ? আমরা পথ ভুলে গেছি।

মহীন্দ্র। কোলকেতার বাবুদের বাড়ি ?

উৎপল। যার সামনে পাঁচটা হরিণ চরে বেড়ায়।

মহীন্দ্র। (হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে) ওই দিকে বড় রাস্তার ধারে।

উৎপল। বড় রাস্তাটাই তো আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকার বন-পথ। তুমি সেটা আমাদের দেখিয়ে দেবে ?

মহীন্দ্র। আমি কেমন করে যাব ? পথটা এখান থেকে আধক্রোশটাক দূর।

উৎপল। আমি তোমাকে টাকা দেব—বখশিশ্। চল।

মহীন্দ্র। না, আমি পারি না।

অরুণ। সে কি রে। টাকা বখশিশ্ দিলেও যাবি না ?

মহীন্দ্র। না। আমার বোনের অসুখ যে।

উৎপল। কি হয়েছে ? জ্বর ? তোমাদের বাড়িটা কতদূর ?

মহীন্দ্র। ঐ বাঁশঝাড়টার ওধারে। বোনের জন্যে মসজিদের জল-পড়া নিতে এসেছিলাম। সে বেহুঁশ হয়ে আছে।

বলাই। তোমার বাবা নেই?

মহীন্দ্র। বাবা গেছে কুরোপাড়ার হাটে। ফিরতে ঢের রাত হবে।

পিন্টু। তোমার মা?—মা নেই? অ্যাঁ?

মহীন্দ্র। নাঃ!

পিন্টু। কোথায় গেছে? মামার বাড়ি?

মহীন্দ্র। মরে গেছে।

উৎপল। তোমার নাম কি?

মহীন্দ্র। মহীন্দর।

উৎপল। মহীন্দর, তোমাকে পাঁচ টাকা বখশিশ্ দেব। আমাদের নিয়ে চল।

মহীন্দ্র। আমার বোনের যে অসুখ। তার কাছে আমার ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ নেই যে!

অরুণ। তবে কি হবে? অন্ধকার যে আরও বাড়লো।

মহীন্দ্র। আচ্ছা চল। জল-পড়াটা বোনকে খাইয়ে তোমাদের সঙ্গে যাব। তুমি ঠিক টাকা দেবে তো? তোমার বাপ আমাকে মারবে না?

উৎপল। আমার বাবা কাউকেই মারেন না। তুমি চল (যেতে যেতে) মহীন্দ্র, তুমি টাকা নিয়ে করবে কি?

মহীন্দ্র। আমার বাপকে দেব। আমরা বড় গরীব!

(সকলে তার দিকে তাকালো। প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

মহীন্দরের বাড়ি। একখানি মাত্র খড়ের ঘর। ভিতরে এক কোণে একটি কেরোসিনের টিপরি জ্বলছে। মেঝের খড়ের ওপর চাটাই পাতা। তার ওপর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে লক্ষ্মী—একটি আট-দশ বছরের মেয়ে। তার মাথার বালিশ নেই। মুখখানি মাত্র দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটি বন্ধ। তার মাথার কাছে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে শ্রীমন্ত—এগারো-বারো বছরের

একটি ছেলে। তার গায়ে-মাথায় একখানি ময়লা চৌখুপী সুতোর চাদর জড়ানো। চোখ দুটি খোলা।

লক্ষ্মী। দাদা রে, একটু জল দে। মাথাটা ছিঁড়ে গেল।

শ্রীমন্ত। (উঠে) খালি জল খাচ্ছিস্। তোর পেটটা যে ডোবা হয়ে গেল। (ঘরের কোণে একটা মাটির কলসী থেকে একটা ছোট পিতলের গেলাসে জল গড়াতে গড়াতে) বাবাও নেই, দাদাও ফেরে না। আমি যে কি করি! (লক্ষ্মীর মুখের কাছে জলের গেলাসটা নিয়ে) হাঁ কর্।

লক্ষ্মী। (জল পানান্তে পাশ ফিরে) আমার খালি মনে হচ্ছে মা যেন এয়েছে।

শ্রীমন্ত। (সভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে) ও কথা বলিস নে! চুপ্। রাম—রাম।

লক্ষ্মী। (হঠাৎ) দাদা রে—ও দাদা—

মহীন্দ্র। (নেপথ্যে) যাই রে!

শ্রীমন্ত। ঐ দাদা আস্ছে মসজিদের জল-পড়া নিয়ে। তুই ভাল হবি, লক্ষ্মী। বুঝলি? লক্ষ্মী! ও লক্ষ্মী। সাড়া দিচ্ছিস্ নে যে!

লক্ষ্মী। (নিঃশ্বাস ফেলে) মা আমাদের পিঠেপুলি খাওয়াতে চেয়েছিল রে! তোর মনে আছে?

শ্রীমন্ত। আঃ! খালি মায়ের কথা বলে। বাবার কথা বলতে পারিস্ নে?

(মহীন্দরের প্রবেশ। তারপর উৎপল, বলাই, পিন্টু, অরুণ ও কুকুরটা। মহীন্দর বাটিটা লক্ষ্মীর মাথার কাছে রাখলো।)

উৎপল। এই তোমাদের বাড়ি?

মহীন্দ্র। হাঁ। ঐ আমার বোন। ঐ আমার ছোট ভাই। নে লক্ষ্মী, জলটুকু খা।

(লক্ষ্মী ও শ্রীমন্ত অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে উৎপলদের দেখতে লাগলো।)

উৎপল। তোমাদের বিছানা নেই? ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকো? ওই কাঁথায় শীত ভাঙে?

মহীন্দ্র। শীত এখনও তেমন পড়ে নি। নে লক্ষ্মী, খা! আমি আবার

এনাদের হরিণওলা বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাব। এক দৌড়ে ফিরে আসবো। তোরা ভরাস্ নে। আমি জয়নাল চাচাকে নজর রাখতে বলে যাচ্ছি।

(জল-পড়াটুকু লক্ষ্মীকে খাইয়ে দিল।)

লক্ষ্মী। (মহীন্দের কানে কানে) ওরা কে ?

মহীন্দ্র। এনারা ? হরিণ-ওলা বাবুর ছেলেরা! পথ হারিয়ে গেছে। এদিকে এয়েছে শিকার খেলা করতে।

পিণ্টু। (বেড়ার গায়ে গোঁজা একটি সুতোহীন লাটাই আর একটা গুলতি দেখিয়ে) ঐ দেখ উৎপলদা, ওদের লাটাই আর গুল্‌তি!

বলাই। চুপ্।

উৎপল। মহীন্দ্র, তোমার বোনকে ডাক্তার দেখে ?

মহীন্দ্র। না। ডাক্তারের পয়সা কোথায় পাব ? ঐ যে জলপড়া দিলাম। চল। আঁধার ঘন হয়ে এল।

উৎপল। অরুণ, তোদের শীত করছে ?

তিনজনে। শীত ? একটু-একটু।

উৎপল। সত্যিই তো। শীত তো বেশি নেই। তবে আমার গায় এত গরম জামা কেন ? (গায়ের কোট ও গলার মাফ্‌লারটা খুলে ফেললো।) মহীন্দ্র, তুমি এগুলো গায়ে দাও।

মহীন্দ্র। আমরা গরিব বলে হতচ্ছেদ্দা কর কেন ?

উৎপল। রাগ করো না মহীন্দ্র। আচ্ছা, তুমি না নাও, তোমার ভাই এটা গলায় জড়াক। আর এই গরম কোটটা রইলো তোমার বোনের ওপর। বেচারী শীতে কাঁপছে।

(মাফলারটা শ্রীমন্তের গলায় জড়িয়ে দিয়ে কোটটা লক্ষ্মীর গায়ের ওপর রাখলো।)

লক্ষ্মী। (কাঁথায় মুখ ঢাকলো।)

উৎপল। (মহীন্দ্রের হাত ধরে টানতে টানতে) চল—চল—চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আটটা বাজে।

(সকলের প্রস্থান

শ্রীমন্ত। (মাফলারটা হাতে করে) কি গরম, এ যে পশমের! ছোঁড়াটা পাগল নাকি রে ? নইলে নিজের জিনিষ কেউ দেয় ?

লক্ষ্মী। (মুখের ঢাকা খুলে) পিরেনটা আমার গায়ের ওপর থুয়ে গেল।

ওর মা-বাপ কত বকবে। দাদা, ওদের সঙ্গের ঐ ছোট্ট ছেলেটাকে আমাদের পরাণের মতো দেখতে নয় রে। সে বেঁচে থাকলে ওর মতোই হতো। উঃ, মাথাটা ছিঁড়ে গেল।

শ্রীমন্ত। কিন্তু বড ছোঁড়াটা পাগল। পাগল নইলে কেউ এমন করে?

ষষ্ঠ দৃশ্য

পল্লী-বাস। বৈঠকখানায় নীলা, সুষমা ও লিলি সোফা ও কাউচে বসে আছে। ঘরের ছাদ থেকে ঝুলছে আলোর ঝাড়। এক কোণে একটা অর্গান, তার ডালাটা খোলা। আর এক কোণে র‍্যাকের ওপর টেলিফোন। মাঝখানে গোল টেবিলের ওপর রয়েছে একটা বড় ফুলের পাত্রে একরাশ টাটকা ফুল। বড় দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজলো।

নীলা। উৎপলরা এখনও এল না।

(নেপথ্যে একেবারে দরজার কাছে কতকগুলো পায়ের শব্দ, ছেলেদের গলার আওয়াজ।)

উৎপল। (ব্যস্তভাবে প্রবেশ) দিদি! দিদি!

নীলা। (উঠে) বাবাঃ! কোথায় সব যাওয়া হয়েছিল শুনি? তোমাদের খুঁজতে দ্বিজুবাবু চারধারে লোক পাঠিয়েছেন।

উৎপল। আমরা কি ছেলেমানুষ যে হারিয়ে যাব? আসছিলুম তো।

নীলা। মা ফোন করেছিলেন। সেখানে সকলে ব্যস্ত হয়ে আছেন; এখনই চল। ও ছোঁড়াটা আবার কে?

উৎপল। আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে।

নীলা। পথ দেখিয়ে এনেছে? তবে যে বললি, 'আমরা কি ছেলেমানুষ, পথ হারিয়ে যাব?' পথ ভুলেছিলি বুঝি? এখনই চল—।

উৎপল। কোথায়?—বাড়ি? না। দাঁড়া মহীন্দর, আমি আসছি।

নীলা। কোথায় যাচ্ছ? ও আবার কি করবে?

উৎপল। ও? ওরা বড় গরিব দিদি। দেখে এলুম ওর বোনটার খুব অসুখ। সে কাঁথা গায়ে দিয়ে মেজেতে শুয়ে আছে।

নীলা। তা তুমি কি করবে?

উৎপল। আমি? বলছি— (বেগে প্রস্থান

পিণ্টু। (সোফায় ক্লান্ত হয়ে বসে) দাদা ! আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। বাড়ি চল !

(উৎপলের প্রবেশ। কাঁধে কম্বল, তোশক, বালিশ, আলোয়ান। সেগুলো মহীন্দ্রের সামনে রাখলো।)

উৎপল। এই নাও মহীন্দ্র।

নীলা। ওই দ্বিজুবাবু। এই দেখুন, উৎপলের কাণ্ড।

দ্বিজুবাবু। (দরজায় দাঁড়িয়ে) এসব কি হচ্ছে খোকাবাবু ? ও সেই হীরুর বড় ছেলেটা ? এই শয়তান ! তুই এখানে যে ! (চড় উত্তোলন)।

উৎপল। (চট্ করে এগিয়ে গিয়ে) কেন ওকে মারবেন ? ও গরিব বলে ? কখনো মারতে পারবেন না। এদিকে এস, মহীন্দ্র। ভয় নেই। আমার জিনিষ আমি তোমাকে দেব। ওদের কিছু নেই। আমার অনেক আছে। সব ওকে দেব। নাও মহীন্দ্র।

দ্বিজুবাবু। তাহলে আমি বাবুকে ফোন করে জানাই।

উৎপল। আমিই ফোন করে মাকে সব কথা বলছি।

(ফোনের কাছে যেতেই ফোন বেজে উঠলো। দ্বিজুবাবু নীরবে মহীন্দ্রের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তাকে ঘুষি দেখাতে লাগলেন।)

উৎপল। (ফোনটা তুলে নিতে নিতে) দিদি, ওকে যেতে দিও না। ও যদি যায় আমি কিছুতেই বাড়ি ফিরব না।···হ্যাঁ, আমি উৎপল। মা শোন, আমরা একজনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তারা বড় গরিব। দেখলাম, তাদের মেয়েটার অসুখ করেছে··· শোনই না আমার কথা ! মেঝেয় চাটাইএর ওপর শুয়ে আছে। গায়ের কাপড়, বিছানা কিচ্ছুই নেই। ···আমরা পথ হারিয়ে গিয়েছিলাম, তাদেরই একটা ছেলে আমাদের পথ দেখিয়ে এইমাত্র বাড়িতে পৌঁছে দিলে। আমি তাকে আমার বিছানা, জামা, গায়ের কাপড় আর পাঁচটা টাকা দেব।···হ্যাঁ আমি দেবই···তবে বাড়ি ফিরে যাব না···কিছুতেই না।···কি বলছ, সংসারে অনেক গরিব লোক আছে ? কেন গরিব লোক থাকবে ? বড়লোকও তো আছে অনেক। আজ আমার জন্মদিন···তুমি তো বলেছো গরীব-দুঃখীদের আজ···দেব তো ?···দেবো ? আচ্ছা মা, তুমি খুব

ভাল। আর শোন, দ্বিজুবাবু···যাঃ কেটে দিয়েছে। (ফোন রেখে) কি হল, মা কি বললে ?

দ্বিজুবাবু। তবুও বাবুর হুকুম না পেলে—

উৎপল। আমিও তো বাবু। আপনি ওকে কিচ্ছু বলতে পারবেন না।

দ্বিজুবাবু। আচ্ছা। (প্রস্থান

উৎপল। দিদি, ওর বোনের মুখখানা তোমার মতো দেখতে।

নীলা। ঐ ছোঁড়াটার বোনের মুখখানা আমার মতো—

উৎপল। না—না। তোমার মুখখানা ওর বোনের মতো দেখতে। তবে তুমি ফর্সা, সে কালো। তুমি তাকে কিছু দেবে না ? দাও না দিদি ?

নীলা। আচ্ছা। (প্রস্থান। কিছু পরে জামা কাপড় নিয়ে প্রবেশ।)

উৎপল। অরুণ, বলাই, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

অরুণ ও বলাই। আমাদেরও আনন্দ হচ্ছে।

উৎপল। আজ আমার জন্মদিন। খালি মনে হচ্ছে এত গরিব লোক কেন থাকবে ? দিদি, তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?

নীলা। না, বড় কান্না পাচ্ছে। আয় খুষি, আয় লিলি, আমরা গান গাই।

উৎপল। মহীন্দ্র, তুমি এসব নিয়ে যেতে পারবে ?

মহীন্দ্র। আমি নেব না।

উৎপল। কেন ?—কেন নেবে না। নিতেই হবে। এসব তোমার। তোমাদের জিনিস আমরা কেন রাখবো ? এই দ্বারোয়ান, দ্বারোয়ান !

দ্বারোয়ান। (নেপথ্যে) হাঁ।

উৎপল। এগুলো ওর বাড়িতে—না, আমিই দিয়ে আসবো। এবার থেকে জন্মদিন করবো ওদের নিয়ে। ওদের যদি জন্মদিন না হয় তবে আমারই বা হবে কেন ? তুমি কবে জন্মেছ মহীন্দ্র ?

মহীন্দ্র। জানি নে।

উৎপল। আজ ! আজ আমাদের সকলেরই জন্মদিন।

(লীলা ও তার বন্ধুদের গান। উৎপল, অরুণ ও বলাইয়ের যোগ)

গান

আমরা শিশু, আমরা আশা, আমরা নূতন প্রাণ
আমরা হাসি, আমরা আলো, আমরা নূতন গান।

ওই যে কুমোর, ওই যে চাষী,
ওই যে রাখাল বাজায় বাঁশী ;
সবার ঘরে আমরা আছি সকলেই সমান !
আমরা শিশু, আমরা হাসি, আমরা নূতন প্রাণ
সকলকে আজ শুনিয়ে দেব এই আনন্দ-গান।

উৎপল। (গানের মাঝে মহীন্দ্রের হাত ধরে টেনে এনে) এস তুমি! তুমি এস আমাদের মাঝে। আমরা সব এক।

(পিণ্টু সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে ফুল ছুড়তে লাগলো। লিলিও ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো।)

যবনিকা



গল্প



খোঁড়া ফকিরের চরিত-কথা

লোকে বড় বড় লোকেরই চরিত-কথা লেখে। আমি লিখছি ফকিরের, খোঁড়া ফকিরের। না লিখবো কেন বল? বিড়ালছানা, কুকুর বাচ্চা নিয়ে যদি গল্প হতে পারে তবে একটি মানুষের ছেলে নিয়ে তা সে যেমনই হোক গল্প হবে না কেন, তা তো বুঝতে পারি না। এই ছেলেটার বাপ ঠাকুরদা, ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিল চাষী।

ছেলেটার বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে পেয়েছিল বিঘে তিনেক ক্ষেত, এক জোড়া বলদ, একটা হাল, আর এক চিলতে ভুঁয়ের ওপর খান দুই কুঁড়ে। ছেলেটার চৌদ্দপুরুষে কেউ লেখাপড়া জানতো না, জানার দরকারও মনে

করতো না, যারা লেখাপড়া জানতো তারাও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ওদের গাঁয়ের ত্রি-সীমানায় ইস্কুল পাঠশালা ছিল না, লেখাপড়া জানা লোক ছিল তিনটে, তাদের দুটো থাকতো শহরে, একটা থাকতো গাঁয়েই, লোকটার অনেক জমি-জমা ছিল যে।

ফকিরের বাবা চাষ-আবাদ করতো, মনিষ খাটতো। পাঁচটা পেট, মানে ফকিরের বাবা, ফকিরের মা, সাত বছরের ফকির আর হালের বলদ জোড়া। তারাও মাঝে মাঝে ভাড়া খাটতো, কাজেই এক রকম চলে যেত।

পড়তে পড়তে ভাবছো, খোঁড়া ফকিরের চরিত-কথার নাম করে তার বাবার কথা লিখি কেন? লিখি এই কারণে যে, কারো চরিত কথা বলতে বা লিখতে হলে তার মা-বাবার কথাও বলতে বা লিখতে হয়। না হলে চরিত-কথা অসম্পূর্ণ থাকে।

তা' খোঁড়া ফকিরের মুখখানা ছিল পানের মত, চোখ দুটো যেন তিত-পুঁটির, রঙটা কালই। তবে গলায় ছিল মিঠে সুর।

একবার তাদের অঞ্চলে হলো অনাবৃষ্টি। কাজেই ফসল বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। খোঁড়া ফকিরের বাবা ছেলে-বউ আর বলদ জোড়াকে নিয়ে এক রকম উপোস করে কয়েক মাস কাটালো। পরের বছর প্রকৃতি সব জলে ডুবিয়ে ধ্বসিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে শান্ত হলো। এমন সময়ে খোঁড়া ফকিরের মা পড়লো জ্বরে। সে জ্বর আর ছাড়ে না। উপোস আর অসুখ হাত ধরাধরি করে তাদের ঘরে এসে ঢুকলো।

গাঁয়ে ছিল এক হাতুড়ে বদ্যি। সাড়ে তিন ক্রোশ তফাতে সরকারি চিকিৎসা-কেন্দ্র। বদ্যির ওষুধে কিছু হলো না। লোকটা বউকে হাসপাতালে পাঠাবারও উপায় করতে পারলে না। এদিকে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। গাঁয়ে প্রায় সব ঘরেই চাল বাড়ন্ত, কেবল সেই লেখাপড়া জানা লোকটির ধানের গোলার মাথায় রাতে বসে লক্ষ্মীপ্যাঁচা, দিনের বেলা চারধারে চরে গোলাপায়রার ঝাঁক।

খোঁড়া ফকিরের বাবা একদিন তার কাছে গিয়ে বলে, 'দা-ঠাকুর, এখন কি করি? পেটে ভাত নেই, পরণে নেই টানা, বউটা ব্যামোয় মরে, ছেলেটা খিদেয় কাঁদে, কিছু কর্জ দেবে?'

দা-ঠাকুর বলে, 'শুধবি কোত্থেকে? কি আছে তোর?

'কেন, জমি।'

'টাকা নিয়ে করবি কি ?'

'মহাপেরাণীকে বাঁচাবো, বউটার চিকিচ্ছে করাবো। ওকে নে যাবো সেই শহরের হাসপাতালে।'

দা-ঠাকুর বলে, 'তাতে ঝামেলিটা কি পোয়াতে হবে, বিবেচনা করেছিস ? হাসপাতালের ভাত খাওয়ালে তোর জাত থাকবে ? যখন হাসপাতাল ছিল না, তখন গাঁয়ের মানুষের ব্যামো হলে চিকিৎসা হতো না ?'

খোঁড়া ফকিরের বাবা বলে, 'যথার্থ কথা। গাঁয়ে বাস করতে গেলে জাত ঠিক রাখতে হয়। কিন্তু বউটার ব্যামো —'

লেখাপড়া জানা লোকটি বলে, 'বুড়ো গোকুল বদ্যির ওষুধে যখন ব্যামো বাগ মানছে না তখন বুঝতে হবে তোর বউটার গায়ে বাতাস লেগেছে। ওকে ঝাড়-ফুঁক করা, তাগা-তাবিজ পরা, পুনসির শ্মশানে গে হত্তে দে—'

খোঁড়া ফকিরের বাবা মূর্খ চাষী। লেখাপড়া জানা লোকের, তার ওপর মহাজনের কথা অবিশ্বাস করে, এমন মন তো তার হতে পারে না। সে বললে, 'আপনি যা বলেছো, তাই করি গে।'

সে লেখাপড়া জানা লোকটার কাছে জমি বাড়ি বন্ধক দিয়ে কেতাবাঁধা নোট এনে মহাপেরাণীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করলে। সেই সঙ্গে গুণীন ডেকে খোঁড়া ফকিরের মায়ের ঝাড়-ফুঁক করা, মসজিদের জলপড়া, বামুনের চন্নামেত্য খাওয়ানো, তার হাতে গলায় কোমরে তাগা-তাবিজ-মাদুলি বাঁধা শুরু হলো। বাপ-বেটা-বলদের মহাপ্রাণী দেহ টিকে রইলো বটে, তবে খোঁড়া ফকিরের মায়ের হাড় জিরজিরে দেহ-খাঁচাটি ছেড়ে প্রাণ-পাখীটি একদিন ভোরের আবছা আলোয় উড়ে চলে গেল। বাপ-বেটা দুজনেই দুঃখে খুব কাঁদলো।

তারপর একটি একটি করে তিনটি বছর কেটে গেল। খোঁড়া ফকির হয়ে উঠলো দশ বছরের। সে মাঠে যায়, গান গায়, খেলা করে। একদিন শহর থেকে আদালতের পিয়াদা এসে ঢোল বাজিয়ে তাদের জমি আর ভিটের বাঁশগাড়ি করলে। খোঁড়া ফকির মনে করলে, ঢোল বাজিয়ে যখন বাঁশ পোতা হচ্ছে, আর লাল কাগজ হাতে, লাল চাদর কাঁধে, কোমরে তকমা আঁটা পিয়াদা এসেছে তখন তাদের মান বাড়লো আর ভারি একটা তামাসা হলো। কারণ, ঢাক-ঢোল বাজে বিয়ে-সাদি লাল-পার্বণে, পিয়াদা আসে মানী লোকের বাড়ি। কিন্তু তার বাপ মাথা চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লো শহরের দিকে।

শহরটার নাম, মনে করা যাক কার্তিকপুর। সেখানে ছিল কয়েকটা বড় বড় কারখানা। প্রায় হাজার দুই বিঘে ধেনো জমি ছিল তাদের তলায় তাদের চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ হয়ে থাকে কালো। খোঁড়া ফকিরের বাবা, সাতপুকুরের চাষী, সেখানে গিয়ে হলো দিন-মজুর। দিনে রোজগার হতে লাগলো তিন-চার টাকা। কাঁচা পয়সা, আসে যায়, জমে না। হাজার লোকের মধ্যে বাপ-বেটা গেল মিশে। দু'জনেরই সঙ্গ-সাথী হলো মেলা। দু'জনেই নেশা-ভাঙ ধরলো। খোঁড়া ফকির চটপট চালাক হয়ে উঠতে লাগলো। বাপ তার খোঁজ-খবর বড় একটা রাখে না। সে-ও বাপের তোয়াক্কা করে না।

এমনি করে সেখানে দুটো বছর কেটে গেল। এমন সময়ে একদিন তার বাপের সঙ্গে তার এক স্যাঙাতের কি নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতে ব্যাপারটা শেষ হলো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথা ভাঙিতে। খোঁড়া ফকিরের বাবা হাসপাতালে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরলোকে পাড়ি জমালো আর সেই লোকটা হলো ফেরার।

এবার চাষী-মজুরের ছেলে খোঁড়া ফকির হলো অনাথ, এতদিনে তার 'ফকির' নাম সার্থক হলো। সে না জানে কারিগরী, না জানে চাষ-আবাদ, না জানে লেখাপড়া। এই অবস্থায় বেঁচে থাকতে গেলে হয় তাকে চুরি-ডাকাতি অথবা ভিক্ষে করতে হবে।

এমন সময়ে গাঁয়ের সেই লেখাপড়া জানা লোকটার সঙ্গে পথে ফকিরের হঠাৎ একদিন দেখা। সে ফকিরের মুখে সব কথা শুনে বলে, 'এমনটা যে হবে, এ জানা কথা। তা এখন চল্ আমার সঙ্গে। আমার বাড়ি থেকে রাখালী করবি।'

কিন্তু খোঁড়া ফকিরের চোখে লেগেছে শহরে জৌলুস। গাঁয়ের অন্ধকার কি আর তাতে সয়? সে বলে, 'না' এবং ছুটে চলে যায় তার এক সঙ্গীর দিকে।

এখন, শহরের দুটি বড় কারবারি দলের নজর ছিল তার ওপর। এক দলের আড়কাঠি দেখে, ছেলেটার মুখখানা মোলায়েম, গানের গলা মিঠে। ওকে দিয়ে ভিক্ষে করাতে পারলে, দিনে পাঁচ টাকা। সে গিয়ে খোঁড়া ফকিরের সঙ্গে ভাব জমায়, বলে, 'রাজার হালে থাকবি। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, থাকার জায়গার অভাব হবে না। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুরে বেড়াবি। ছেলেতে মেয়েতে তোর বন্ধু হবে অনেক।'

খোঁড়া ফকির বলে, 'ব্যাপারটা কি শুনি।'

আড়কাঠি তার হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলে, 'তুই পথের ধারে বসে, কি রেলের কামরায় চড়ে বা বাসে ঢুকে গান গাইবি। সিনেমার গান নয় কিন্তু, শ্যামা সঙ্গীত, কি দেশকে ভালবাসার, কিংবা দুঃখের—সে ওরা শিখিয়ে দেবে আর মাঝে মাঝে বলবি, তুই অনাথ, অসুখে তোর চোখ দুটো—'

'কি বললে?'

'চোখ দুটো খালি কানা করে দেবে। সে তুই টেরও পাবি নে। নইলে কে তোকে ভিক্ষে দেবে? মেয়েদের কাছে আর জোয়ানদের কাছে ভিক্ষে চাইবি! বুড়োদের কাছে চাইবি না। ওরা ভারি ঘুঘু। দেখিস দিন দশ টাকা রোজগার। আধা তোর, আধা কর্তাদের।'

খোঁড়া ফকির বলে, 'মাইরি যা বললে। আমার কানা হবার কি দরকার? চোখ থাকলেও কানা হওয়া যায়। ঐ যে বাসের গুমটিতে আলুমুখী, ঝাঁকড়াচুলী, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট-পরা কানীটা ভিক্ষে করে ও তো চোখে দেখতে পায়। বলে, 'আমি কি পরের চোখে দেখি? আমি না বললে, লোকে কিসে বুঝবে আমি কানা? তোরা কানা তাই আসলটা দেখতে পাস্ না।'

আড়কাঠি হো হো করে হাসে, বলে, 'ছুঁড়িটা ভারি বেয়াড়া। ও আমাদের লোক নয়। তুই আমাদের দলে ভিড়বি?'

খোঁড়া ফকির বলে, 'তোদের দলে ভিড়তে যাবো কোন্ দুঃখে? নিজেই রোজগার করবো। তবে মতলবটা দিয়েছিস্ ভালো। তোকে একদিন পেটভরে পকৌড়ী খাওয়াবো—'

এবং সেদিন থেকেই সে অন্ধ সেজে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে শুরু করে দিলে।

কয়েকদিন পরে বিকেলের দিকে একটি মাঝ-বয়সী লোক রাস্তার মোড়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার দিকে তাকিয়ে একমনে গান শুনতে শুনতে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে তাকে ধরে টানতে টানতে একধারে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তুই খাসা গাইতে পারিস্ তো! যাত্রাদলে কাজ করবি?'

খোঁড়া ফকির বলে, 'আমি যে অন্ধ।'

লোকটি বলে, 'বাবা, আমি তো অন্ধ নই। সব পরিষ্কার দেখছি। কাজ করবি? খোরাকি ছাড়াও মাইনে পাবি মাসিক বিশ টাকা। তোর বাড়ি কোথায়? কে আছে তোর?'

'আমার বাড়ি নেই, মা নেই, বাবা নেই—আমি অনাথ।' বলেই খোঁড়া ফকিরের বুক থেকে ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই সে নিজেই চমকে ওঠে।

লোকটি বলে, 'তবে চল্ আমার সঙ্গে। আমার একটা যাত্রাদল আছে।'

ফকির কি ভেবে অধিকারীর সঙ্গে চলে গেল। শুরু হলো তার নতুন জীবন। সে দলের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। বারোয়ারিতলায়, মেলায়, ধনীর বাড়ীতে পালা হয়—দু'রাত, তিন রাত। ফকির অভিনয় করে, গান গায়। রাধা সাজে, লক্ষ্মী সাজে, একবার কৃষ্ণও সাজলো। বুড়ো-বুড়ী, ছোঁড়ার দল তার গান শুনে মেতে যায়। অন্য সময়ে তাকে দেখতে ভিড় জমে।

একবার অধিকারীর বায়না হলো। এক মহাত্মার জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে পালা গাইবার। অধিকারী দল নিয়ে গেল সেখানে। মহাত্মা মণিরাম জন্মদিনটি পালন করেন তাঁর পল্লী-ভবনে, মানে গাঁয়ের বাড়িতে। তিনি মস্ত কারবারি—দুটো চালকলের আর একটা ময়দাকলের মালিক। গোটা তিনেক কেরোসিন তেলের ডিপোও আছে। জোত-জমা সব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক লাখ, মেয়ে-ইস্কুলে পঞ্চাশ হাজার, কি একটা ফণ্ডে এক লাখ, এমনি করে লাখ লাখ টাকা দান করে মহৎ কাজ করেছেন। লোকে তাই তাঁকে বলে, মহাত্মা। মহাত্মা মণিরাম, সকালে গীতা পড়েন, রাতে কীর্তন শোনেন, কপালে চন্দনের মস্ত ফোঁটা। মহাত্মাজী সুতীর কাপড় পরেন না, অঙ্গে রেশমের ধুতি-চাদর-পিরাণ, পায়ে হরিণের চামড়ায় সাদা চটি পরেন। এমন খাঁটি মানুষ, তবু গরীব ছোটলোকেরা বলে 'ও তেলে জল, চালে কাঁকর, ময়দায় কাঁইবিচি মেশায়, লাখ লাখ টাকা আয়কর ফাঁকি দেয়। ওর জোত-জমা সব বেনামী।' যে যা বলুক, সেই মহাত্মারই সেবার জন্মদিন।

শহর থেকে কত লেখাপড়া জানা লোক, কত মান্য গণ্য মানুষ এসেছেন তাঁর সুন্দর পল্লীভবনে শ্রদ্ধা জানাতে। জগদীশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান খবর-কাগজের লোকেরাও এসেছেন হাতে ক্যামেরা, বুকে কলম এঁটে তাঁর ছবি তুলতে, তাঁর কথা লিখে নিতে। বুঝেছি, এ সব কথা তোমাদের ভাল লাগছে না। আমারও লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করছে।

তা ক'দিন খুব আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, দান-খয়রাত হলো। খোঁড়া ফকিরে কণ্ঠে, 'আমি ভক্তের তরে ঘাটে ঘাটে নিয়ে

বেড়াই খেয়াতরী' গানখানি শুনতে শুনতে মহাত্মা মনিরামের চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চক্ চক করে উঠলো। সেই সময়ে খবরের কাগজের লোকেরা 'ক্লিক' করে তার চোখ-মুখের ছবি তুলে নিলে। কাগজে ছাপা হবে যে। যা হোক, একদিন উৎসব শেষ হলো। সকলে যে যার কাজ সেরে নিজের পথ ধরলো।

অধিকারীও দল নিয়ে রওনা হলো আর এক গাঁয়ে পালা গাইতে। কিন্তু বেচারীর কলেরা হলো এবং সেখানেই মারা গেল। তার দলটিও গেল ভেঙে। খোঁড়া ফকির আবার হলো নিরাশ্রয়। কিন্তু অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়ে তার ধারণা হলো থিয়েটারে বা সিনেমায় গেলেই তাকে লুফে নেবে। কিন্তু আশা-নিরাশা দুই বোন পাশাপাশি থাকে। আশা আমল না দিলে নিরাশা চেপে ধরে। আবার, নিরাশার হাত থেকে আশা ছিনিয়ে নিয়ে খেলা করে। তাই খোঁড়া ফকির দুইয়েরই পাল্লায় পড়লো।

সে শহরে ফিরে এক থিয়েটারের কর্তার কাছে গিয়ে ডেঁপোমির জন্যে কানমলা খেতে খেতে বেঁচে গেল। আর, সিনেমার কর্তার হদিশই পেল না। সেখানে উঠতে নাকি সিঁড়ি ভাঙতে হয় বিস্তর। যার চোর-খাজ আছে অনেকগুলো। এমন সময়ে তাকে পাকড়াও করলে, দ্বিতীয় দল গাঁটকাটাদের আড়কাঠি।

সে বলে, 'বুঝলি ফকু, দিনে হাজার টাকা রোজগার। আধা তোর, আধা আমাদের। ভাল পোশাক পরবি, ফাস্‌কেলাস খানা খাবি, বক্সে বসে সিনেমা দেখবি, ট্যাক্সি চড়বি। পুলিশ পাকড়ালে খরচ পত্তর আমাদের। কত বড় বড় লোক এ কারবারের অংশীদার জানিস্? তবে দু'মাস তালিম দিতে হবে। তখনকার খরচা কোম্পানীর। পাস করলে, রোজগার হতে থাকলে দেনা মিটিয়ে দিবি। চল্ এক প্লেট কষা মাংস আর রুটি খেয়ে লিবি। নে, সিগরেট ধর।'

খোঁড়া ফকির গাঁটকাটার দলে ভিড়ে দেখলে সে এক নতুন জগত। দিনে-রাতে সোনা-দানা টাকা-পয়সার বিরাট কারবার। সে তিনমাসে সব শিখে নিয়ে শহরের এক অংশে আঙুল খেলানোর বিদ্যে খাটাতে লাগলো। তাদের দলে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মর্দ মানে সব বয়সের সকল ভাষা-ভাষীর মানুষ। এক-একদলের এক এক ছন্দো। তার ওদিকে গেলেই ছুরি-ছোরা বোমা-সোডার বোতল। সকলেই বেপরোয়া।

বছর দুই বেশ চললো। যেমন মোটা আয় তেমনি খরচ—টাকা-পয়সা, সোনাদানা যেন হাতের ময়লা। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন রেসের মাঠে মহাত্মা মণিরামের ছোট ছেলের পকেট মারতে গিয়ে তার এক ইয়ারের হাতে খোঁড়া ফকির ধরা পড়লো। আর যায় কোথা? খুচরো ও পাইকিরি হারে মার তো খেলই আবার আদালতের বিচারে তার হলো ছ'টি মাস জেল।

খোঁড়া ফকিরের বয়স তখন বোধ হয় হবে চৌদ্দ-পনেরো বছর। সে ভাবতে শিখেছে—ভাবতে শিখেছে জীবন ও জগতের কথা। জেলের নিঝুমতায় রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে ভাবে। ভাবে, কি ছিল, কি হয়েছে! সেই গাঁ, সেই মজুর বস্তি, সেই যাত্রাদল, বাবা-মা—বায়স্কোপের ছবির মতো তার জীবনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। আর ফিরে আসবে না। সে এখন চোর, গাঁটকাটা, জেলের কয়েদী। কেন সে এমন হয়েছে? কে এর জন্যে দায়ী? কিন্তু ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না।

একটি দুটি দিন করে ছ'টি মাস কেটে গেল—সে একদিন সকালে মুক্তি পেল। কিন্তু কোথায়, কার কাছে যাবে? তার নিজেকে মনে হচ্ছে ভারি নিঃসঙ্গ, নিতান্ত একা, নিরাশ্রয়। একটি বস্তির পাশ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ পিছনে হৈ হৈ শব্দ। ফিরে দেখে, একটি দু' তিন বছরের মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার দিকে মত্ত ঐরাবতের মতো ছুটে আসছে একখানা মাল বোঝাই লরি। মেয়েটা নির্ঘাত চাপা পড়বে। ড্রাইভার ব্রেক কষেও ওকে বাঁচাতে পারবে না। ও পোকার মত পিষে যাবে। খোঁড়া ফকির ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে ছোঁ দিয়ে তুলে একধারে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতেই লরির চাকা এসে পড়লো তার একখানা পায়ে। তারপর আর সে কিছু জানে না।

সাত মাস পরে হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেল তখন তার ডান হাত আর ডান পা নেই, সেই ভাঙা খাঁচাতেই প্রাণপাখিটি আছে। আর, হাসপাতালের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটার মা। ও রোজ এসেছে।

ফকির, খোঁড়া ফকির, সেই বস্তির ধারে বুড়ো বটতলায় একটা প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সের মধ্যে বাসা নিলে। সামনে রাজপথ। সে নিজেকে খোঁড়া হাত-পা দেখায় আর গান গায়—যাত্রাদলে শেখা গান। পথিকেরা তার গান শোনে, ইচ্ছামত তাকে ভিক্ষা দিয়ে যায়।

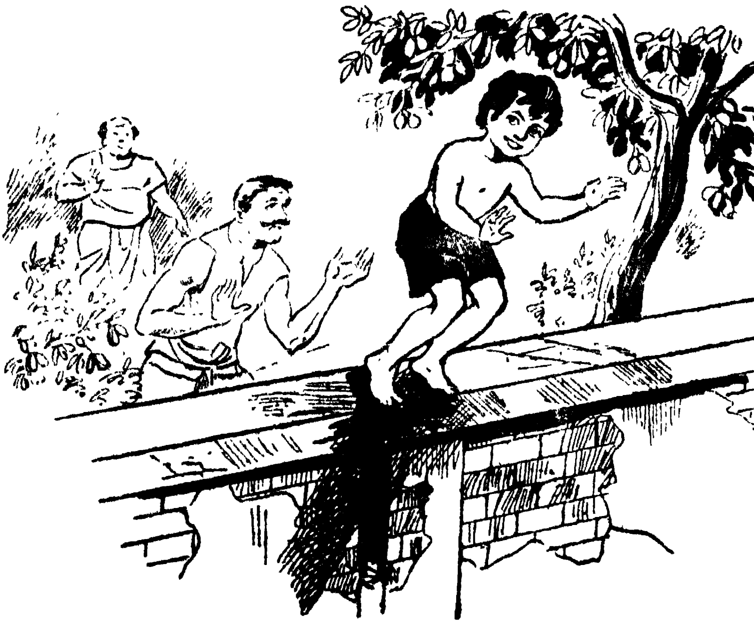
ভিক্ষের কড়িগুলো নিয়ে যায় সেই মেয়েটার মা। সে ওকে খেতে দেয়। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোয় আর বলে, বাবা, তুই আমার আর-জন্মের ছেলে।

খোঁড়া ফকিরের দু' চোখ বেয়ে জল ঝরে।

সেই লরিখানা ছিল মহাত্মা মনিরামের। আদালতে প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষ্য বলে 'ড্রাইভার মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছোঁড়াটা লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে পড়েছিল। ড্রাইভারের দোষ নেই।'

আমরাও তাই বলি। ড্রাইভার বেকসুর খালাস পায়। মণিরাম খবরটা শুনেও ছোঁড়াটাকে দেখতে যান না। তিনি মহাত্মা, উর্ধ্বলোকবাসী। আর ওরা হলো নিচুতলায় বস্তির মানুষ।

যাক ও কথা। ফকির সেই খোঁড়া। এখন শহর থেকে দূরে থাকি তাই খোঁড়া ফকির সম্বন্ধে আর কিছু জানি না।



আষাঢ়ে কাহিনী

"পাজি, ছুঁচো, শয়তান! তোকে মেরে—না, না, মারে তোর মতো ছেলের কিসসু হবে না। পুলিশে দেবো।" ধাড়ামশাই পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে বেশ গলা ছেড়ে কথাগুলো বলছিলেন আর ছেলেটার নড়া ধরে মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিচ্ছিলেন।

ছেলেটা নির্বিকার চিত্তে মুখের পেয়ারার অভুক্ত অংশ চিবুচ্ছে আর হাতের কৌটোটার দিকে তাকাচ্ছে।

ধাড়ামশাই আবার বললেন, "বল, কেন এ কাজ করেছিস্? কার ছেলে তুই? অমন উঁচু পাঁচিল টপকালি কি করে, বল? না বললে"—আবার ছেলেটার নড়া ধরে জোর ঝাঁকি দিলেন।

পুকুরটার তিনদিকে দশফুট উঁচু পাঁচিল, একদিকে ধাড়ামশাইয়ের দোতালা বাড়ি। পুকুরের পাড় ঘিরে কয়েকটা পেয়ারা, গন্ধরাজ ও কাগজি লেবুর গাছ, এককোণে শশা ও কুমড়ো মাচা, আর এককোণে কয়েকটা নারকেল আর ঘাটের কাছাকাছি একটা তালগাছ। ভরা বর্ষা। যেমন পুকুরে জল থৈ থৈ করছে, তেমনি সব গাছে ফল।

"দেখি কৌটো?" বলে ধাড়ামশাই ছেলেটার হাত থেকে কৌটোটা

কাড়বার চেষ্টা করতেই সে খপ্ করে সেটা উপুড় করে দিল। তেমনি কয়েকটা ল্যাটা ও পুঁটি ঘাসের ওপর পড়েই দু'তিন লাফে জলে নেমে, কোনটা একটু চিৎ হয়ে থেকে, কোনটা সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল।

"ওরে শয়তান! এতগুলো মাছ এই আক্রা-গণ্ডার দিয়ে চুরি করেছিলি? আবার পেয়ারাও চুরি করেছিস্? লোকে যেমন করে গরু খোঁয়াড়ে দেয় তোকেও আজ তেমনি করে থানায়—বল, কার ছেলে তুই?"

"মহিমের।"

"কোথায় থাকে সে?"

"সগ্‌গে।"

"পাজি! আবার ইয়ারকি?"

"মিছে বলছি নে। মা-বাবা সগ্‌গে গিয়ে বেঁচেছে। বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে দেখে আসুন।"

"বটে।" ধাড়ামশাই বুঝলেন, ছেলেটার বাবা মহিম নামক ব্যক্তিটি মারা গেছে। আর যার এ রকম গুণময় ছেলে সে যে মরে বেঁচেছে এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, "তোর নাম কি?"

"পালান।"

"মানে?"

"জানি নে।"

"কেন জানিস নে? ছেলেবেলা থেকেই পালাচ্ছিস বলে তোর বাপ না ঐ নাম রেখেছে?"

"আমি এখনও ছেলেমানুষ। আপনার মতো বুড়ো ধাবড়া নই। পালাই না।"

"তবে তোর নাম পালান কেন।"

"আমার বাপের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন। হাত ছাড়ুন। লাগছে।"

"ছাড়বার জন্যে ধরেছি? তোকে পুলিশে দেবো। কোথায় থাকিস্?"

"ঐ দিকে?"

"কোন্ দিকে?"

ধাড়াবাবু হাঁকলেন, "ভোলানাথ! এই ভো—"

বেশ ষণ্ডাগোছের একটা লোক এসে দাঁড়ালো। তার মুখে-চোখে বিরক্তি ও কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসার চিহ্ন।

ধাড়াবাবু বললেন, "একে চিনিস্ ?"

ভোলা বললে, "ছোটবাবুর স্যাঙাৎ।"

"ব-টে। এইসব ছেলের সঙ্গে মেশা হয়, তাই আজকাল পড়াশুনোয় মন নেই। ডাকতো তাকে।"

পালান বললে, "হাত ছাড়ুন।" বলে এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পুকুর পাড় দিয়ে দৌড়।

ধাড়াবাবু একে মোটা, তার ওপর বুড়োমানুষ। তার পিছু নিলেন না। "ধর ধর" বলে হাঁক দিতে লাগলেন।

ভোলানাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিবের খাতির রাখতে পালানের পিছু নিল। কিন্তু পালান খরগোসের মতো লাফে লাফে ছুটে কাঠবেড়ালীর মতো পেয়ারা গাছটায় উঠে, তার ডাল ধরে পাঁচিলের মাথায় নেমে এক লাফে ওধারে পড়লো। এমন ব্যাপারে ধাড়াবাবু ও ভোলানাথ উভয়েই হতভম্ব!

ধাড়াবাবু হাঁকতে হাঁকতে—বললেন, "ধরতে পারলি না, বোকা গঙ্গারাম!"

ভোলা বললে, "আজ্ঞে, যে আপনার হাত ছাড়িয়ে পালায় তারে—ধরে কার সাধ্যি!"

"কার সাধ্যি!" বলে ধাড়াবাবু তাকে ভ্যাঙচালেন। "দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।"

"আজ্ঞে তাই চললাম।"

ধাড়াবাবু গুটি গুটি পেয়ারা গাছটার ধারে গিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠলেন।

"অ্যাঁ গাছটা একদম ফাঁকা! সব পেয়ারা একদম পেড়ে নিয়েছে? উসকো খুসকো লেগা! শয়তান! পাজি! চোর!" বলতে বলতে গন্ধরাজ লেবুর গাছটার কাছে গিয়ে দেখেন, সেটিতেও লেবু নেই! বড় শখের গাছ! ঘোলের শরবৎ, মিছরির জল, চিঁড়ে-ভিজে, মাছের ঝোল ঐ লেবুর গন্ধে যে মেতে ওঠে। হতভাগাটা কিনা—পরক্ষণেই ধাড়াবাবুর মনে হোল, ঐ ছোঁড়াটাই যদি পেড়ে নিয়ে থাকে তাহলে পেয়ারা আর লেবুগুলো গেল কোথায়? ওর কাছে তো দেখতে পাওয়া গেল না। ছোঁড়াটার পরনে

আধময়লা হাফপ্যাণ্ট, গায়ে জামাও নেই। প্যাণ্টের দু' পকেটে আর কত ধরে? এই চুরির মধ্যে গভীর রহস্য আছে। ধাড়াবাবু ভাবতে ভাবতে পালানের পরিত্যক্ত কঞ্চির ছিপগাছটি হাতে তুলে নিলেন। বঁড়শিতে তখনও আধ-খাওয়া কেঁচোর টোপ গাঁথা।

ইতিমধ্যে ভোলানাথ পাচিলের মাথা থেকে নেমে এসে বললে, "বাবু, পাঁচ-ছটা ছোঁড়া ছুটে পালাচ্ছে দেখলাম! ওদের মধ্যে ছোটবাবুও রয়েছে মনে হোল।"

"ঠিক দেখেছিস্?"

"তাই তো মনে হোল। আমার দিকে ফিরে একবার মুখে আঙ্গুল দিলেন। তারপর ঘুষি দেখালেন।"

"আর সেই পালানটাও দলে আছে?"

"সে থাকবে না? ঐ তো পালের গোদা!"

"ব—টে! দেখছি।"

ধাড়াবাবু হুঙ্কার দিলেন, "দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলি?"

"এই তো—ঐ তো—এখানেই ছিলাম, মাধবরা তাস খেলছে, দেখছিলাম। ঐ যে তেলেভাজা উড়ের দোকানের বারান্দায় ওরা খেলছে।"

ধাড়াবাবু দেখলেন, সত্য বটে, কয়েকটা লোক গামছা গায়ে দিয়ে গোল হয়ে বসে কি করছে। তবু বললেন, "তাহলে ভোলা মিথ্যে কথা বলছে?"

"ভোলা? কোন্ ভোলা? ঐ-টে? ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কাকে দেখতে কাকে দেখেছে, অমনি আমার নাম দিলে!" বলে গোপালকৃষ্ণ এমনভাবে ভোলানাথের দিকে তাকালো যার অর্থ স্বয়ং ভোলানাথ বুঝে একটু শঙ্কিত হোল। ছোটবাবুর দলটি বড় কম নয়!

ধাড়াবাবু কিছুক্ষণ পূর্বের ঘটনাবলী শ্রীমানের কাছে বর্ণনা করে জিগ্যেস করলেন, "পালানকে চেন?"

"পরান?"

"পরান নয়, পরান নয়, পালান, পালান, পলায়ন।"

শ্রীমান ফিক্ করে হেসে ফেলেই বললে, "পলায়ন-পলায়ন নামে কাউকে চিনি না।" এবং আর না দাঁড়িয়ে ওপরে উঠে গেল।

পরদিন। রথের মেলা বসেছে বড় রাস্তার দু'টি পাশ জুড়ে কত রকমের খেলনা-পুতুল, কাঠকুটরি, ধামা-কুলো, ফল-ফলুরি, তেলেভাজা কাঠখোলা ভাজার দোকান। ভেঁপু বাজে, বাজে খোল-করতাল, আর বাজে ডুগডুগি। ঘুরছে নাগরদোলা, ঘোড় চরকি। তাঁবুর মধ্যে খেলা হচ্ছে ভানুমতীর। সোদর বনের বাঘটা ডেকে সারা। চারধারে লোকের সোরগোল, হাঁকাহাঁকি। কিন্তু রথ মোটে একখানি। তবে একতলা-সমান উঁচু।

ধাড়াবাবু ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে নাতির হাত ধরে এসেছেন মেলায়। ভোলানাথের কাঁধে ধামা, হাতে কুলো, ধামায় গোটা দুই আনারস, গোটা পাঁচেক ফজলি আম।

নাতি বায়না ধরলে, "পেয়ারা খাবো।" তারপরেই বললে, "ঐ যে ছোটকাকু, পালানকাকু।"

"কৈ—কৈ?" বলে ধাড়াবাবু চারধারে তাকাতে লাগলেন।

নাতিটি বললে, "ঐ যে পেয়ারা বেচছে।"

"পেয়ারা বেচছে। বলিস্ কী?"

ঠিক তখনই সামনের ভিড়টা একটু পাতলা হলো। ধাড়াবাবু দেখলেন, সত্যি-তো! একখানা চটে পেয়ারা গন্ধরাজলেবু কাগজিলেবু সাজিয়ে ওরা দু'জনে বসেছে, আর ওদের পেছনে চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, "পেয়ারা-- পেয়ারা। ডাঁশা-পাকা-পাকা-ডাঁশা।" আর হি-হি করে হাসছে।

কেউ—কেউ কিনছেও।

দেখেই ধাড়াবাবুর সব শরীর জ্বলে উঠলো। তাঁর গাছের পেয়ারা আর লেবু এসেছে রথের মেলায়! তবে কাজটা গোপালেরই? না হলে ঐ রোগা পটকা পালানের ক্ষমতা কি তাঁর বাগানে ঢোকে! তিনি হাতের মোটা লাঠি উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে তাদের দিকে তেড়ে যেতেই তারাও তাঁকে দেখেই দোকান গুছিয়ে ভিড়ে মিশে গেলো। দর্শকেরা হাঁ হয়ে রইলো। কেউ কেউ গল্প ফাঁদতে লাগলো।

ধাড়াবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরলেন।

সন্ধ্যায় একটা লোহার দাঁড়ে একটা সাহেব বুলবুলি নিয়ে শ্রীমান গোপালকৃষ্ণ বাড়ি এলো। ধাড়াবাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন, "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে। বেরো—বেরো, তোর মতো ছেলে দরকার নেই।"

গোপালকৃষ্ণ যেন আকাশ থেকে পড়লো. বললে, "আমি কি করেছি?"

"কি করেছো? গাছের পেয়ারা-লেবু চুরি করে রথের মেলায় বেচতে বসেছিলে?"

"আমি?"

"হাঁ—হাঁ। তুমি আর পলায়ন। আর চার-পাঁচটা ছেলে।"

"কে দেখেছে?"

"আমি স্বচক্ষে। সঙ্গে ছিল মিন্টু আর ভোলা।"

"ও! সে আমাদের দোকান নয়। দোকানটা হচ্ছে—"

"আবার মিছে কথা। গোল্লায় গেছ।" রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কি মতলবে এমন নোংরা কাজ করলি? বল। আজ তোকে মেরেই ফেলবো।"

ধাড়াবাবুর হুঙ্কারে গর্জনে বাড়ির সকলে এসে দরজায় জড় হোল।

ধাড়াবাবু হাঁকলেন, "কে তোকে মতলব দিয়েছে? বুলবুলি কিনেছিস, পয়সা পেলি কোথায়? চুরি করতেও শিখেছিস্? এত নোংরার মধ্যে নেমেছিস্?" বলতে বলতে ধাড়াবাবুর গলার স্বর বন্ধ হোল, দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

অমনি গোপালকৃষ্ণেরও চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেন কাঁদলো তা সে বলতে পারে না। আমরাও বলতে পারবো না তবে সে কাঁদতে লাগলো।

ধাড়াবাবু আর কিছু বললেন না, বলবার মতো খুঁজেও পেলেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। শ্রীমান্ গোপালকৃষ্ণ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে স্পর্শ করতেও কারো প্রবৃত্তি হোল না। কেবল তার মা তার হাতখানি চেপে ধরে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে হাতখানি সরিয়ে তার মুখের দিকে জলভরা চোখ দুটি একবার তুলে বেরিয়ে গেল।

তবে সে কোথাও গেল না, যাবার উপায়ও ছিল না, দিন চারেক আগে পথে হেঁটে হোঁচট লেগে পায়ের আঙুল কেটে গিয়েছিল। তারই তাড়সে মাথা টিপ টিপ করতে করতে সন্ধ্যার পরই জ্বর এলো।

ডাক্তার এলেন; ওষুধ দিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ গোপালকৃষ্ণ সেই রাত থেকে কয়টি কথা বার বার বলতে লাগলো, "এত নোংরায় নেমেছিস্?"

এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত ঐ কথা কয়টি বলতে বলতে চলে গেল। কাকে বলে গেল? অথবা বন্ধু-বান্ধবদের?



বিপিনবিহারীর চোর ধরা

বিপিনবিহারী বাড়ীর বারান্দায় বসে পাপর ভাজা খাচ্ছে। তাদের বাড়ীর পাশেই এক ছোটখাটো তেলেভাজা খাবারের দোকান।

দুটি ছেলে গলা ধরাধরি, ঠেলাঠেলি করতে করতে সেখান দিয়ে বোধহয় কোন পার্কে চলেছে। একজন থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বিপিনবিহারীর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সে বিপিনবিহারীকে চিনতে পেরেছে। মনে মনে বলে, "হ্যা হ্যা সেই।"

সঙ্গী বলে, "কিরে, দাঁড়ালি কেন?"

ছেলেটি তার কানে কানে কি বলে। শুনে সে-ও থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বিপিনবিহারীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিপিনবিহারী পাঁপরে এক কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি চাই?"

ছেলে দুটি চুপ করে থাকে।

বিপিনবিহারী পাঁপর চিবুতে চিবুতে বলে. "ও রকম করে তাকিয়ে থাকা অসভ্যতা। কি চাই?"

প্রথমজন বলে, "কিছু না। আপনাকে দেখছি।"

"আমাকে? আমাকে দেখছো কেন?" এবার বিপিনবিহারী অবাক হয়ে হাঁ করে তাদের দিকে তাকায়। জিভে আধগেলা পাঁপর দেখা যায়।

আজকাল দেশের এই এক কেমন ধারা যে রাস্তায় নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে

কারো সঙ্গে দুটো কথা বলার উপায় নেই। কারো সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছো কি অমনি হয় ভিখারী, নয় পকেটমার অথবা কৌতূহলী—লোক পাশে এসে দাঁড়াবে। আর যদি দু'পক্ষে তর্কাতর্কি বা একপক্ষে চড়া গলায় কথা বললে তো রক্ষা নেই। দেখতে দেখতে ভীড় জমে ওঠে। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় কেউ জানে না—হাতাহাতি, মারামারি পরিশেষে পুলিশের গাড়ী,—তারপর সব ফাঁকা যেন কিছুই হয়নি। এই হলো শহরের অবস্থা।

কিন্তু বিপিনবিহারীর বাড়ীখানা শহরেও নয়, শহরতলীতেও নয়, দুইয়ের সীমান্তে। কিন্তু যেখানেই হোক ব্যাপার সবত্রই সমান। এখানেও দুই দুই একটি করে চলতি লোক জমে।

ছেলে দুটির কারোরই নাম আমার জানা নেই, থাকলে লিখতাম। কেবল বিপিনবিহারীকে চিনি। সে নিজের কৃতিত্বে বড় হয়ে উঠেছে। গল্পটা সেই সম্বন্ধেই।

দ্বিতীয় ছেলেটি বলে, "আচ্ছা আপনিই চোর ধরেছিলেন, আঁা? চোরটার হাতে ছোরা ছিল—"

"আপনার বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে ছোরাখানা উঁচিয়ে—"

সংসারে ভাল মানুষেরও নিন্দুক আছে। শত্রুরও অভাব নেই।

প্রথম ছেলেটির কথায় বাধা দিয়ে ভিড়ের মাঝ থেকে একজন টিপ্পনি কাটে "ও চোর ধরবে? ধরেছে আর একজন, নাম হয়েছে ওর। সত্যি কথার আর দিন নেই।"

ততক্ষণে বিপিনের পাপর খাওয়া শেষ। সে মুখের তেল হাতের তালুতে মুছতে মুছতে বলে, "আপনারা আমার বাড়ীর সামনে কেন ভীড় করছেন? এতে খুব অসুবিধা হচ্ছে।"

ছেলে দুটি আর যাই হোক বেশ তুখোড়। একসঙ্গে বলে ওঠে, "আপনার চোরধরা গল্পটা বলুন না। আমাদের বীরত্বের শিক্ষা হবে।"

বিপিনবিহারী বলে, "সে তো কাগজে বেরিয়েছে।"

"আপনার মুখে শুনলে খুব ভাল লাগবে। কাগজওলারা ঠিক লেখে না। নিজেই বলুন না, স্যার।" জনতার একজন বলে ওঠে।

বিপিনবিহারী বলে, "সে এমন কিছু মস্ত ব্যাপার নয়, সবাই পারে। চোর ধরা খুব সহজ। কিছুকাল থেকে আমাদের এই অঞ্চলে চোরের উপদ্রব শুরু

হয়। কবে থেকে? তারিখটা বলতে পারবো না। তবে শীতের পরেই, এটার প্রমাণ আছে। কী প্রমাণ? সেদিন রাস্তার ধারে ঐ টিউবওয়েলটা বসাবার ঘণ্টাকয়েক পরেই গোটা পাম্পটা চুরি যায়। তারপর থেকে একে একে সব বাড়ীতেই চুরি হতে থাকে। কেউ কেউ রাতে চোরকে দেখতেও পায়। কারো বাড়ীর পাইপ বেয়ে উঠছে বা ছাদের আল্‌সেয় নামছে অথবা জানালার গরাদে বাঁকাচ্ছে কিংবা দরজা দিয়ে বাক্স-পেঁটরা মাথায় করে কি বোঁচকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। চোরটা কি রকম দেখতে? এক-একজনে এক এক রকম বর্ণনা দিত। কেউ বলতো লোকটা কালো ঢ্যাঙা, কেউ বলতো বেঁটে গাঁট্টা গোঁট্টা, কেউ বলতো তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল চোখে আগুন, কেউ বলতো ফরসা ছিপছিপে। রাতের অন্ধকারে ঘুম চোখে কোন কিছুর আসল রূপ ঠাহর হয় না। সেজন্যেও এই বর্ণনার মিল না থাকাই সম্ভব, আবার এক একটা চোর পালা করে এক এক রাতে চুরি করতো বলে এমনও হতে পারে। মোদ্দা কথা চুরিটা হতো। জিগ্যেস করছো পুলিশ কিছু করতো না? চোরকে ধরে পুলিশের হাতে দিলে তাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া তারা আর কিই বা করতে পারে? পুলিশ তো আর দারোয়ান নয় যে লোকের বাড়ী পাহারা দেবে? কে চোর কে সাধু তা তারা কি করে জানবে? দু'জনকেই তো দেখতে একরকম। বরং চোরই অনেক সময়েই অতি ভদ্র, বিনয়ী সুবেশ হয়। তাই নয়?

একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চিলেকোঠা টপকে চোর ছাদে নামতেই তিনি ধরে ফেলেন। চোরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে নস্যি দিয়ে সাময়িকভাবে কানা করে সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্ করে নেমে সদর দরজা খুলে রাস্তায় পড়ে। ভদ্রলোক ও চোখ রগড়াতে রগড়াতে 'চোর চোর' বলে তার পিছু নেন এবং পথে বেরিয়ে পড়েন, তখন সেখান দিয়ে ডিউটি সেরে যাচ্ছে এক পাহারাওয়ালা। ভদ্রলোক তাকেই চোর মনে করে জাপটে ধরল। তারপর যে কাণ্ড হলো তত রাতেও জায়গাটা, ঐ যে বস্তির মুখটাতে লোকে লোকারণ্য। চোর আর তার দলের লোকেরাও হয়তো তার মধ্যে ছিল।

পাহারাওয়ালা ভদ্রলোককে কিছুতেই ছাড়ে না, বলে, "এও চোর। দেখুন না কী চেহারা বদমায়েসটার।' আসতে আসতে দেখি এক ভদ্রলোক চোর চোর বলে চিল্লাতে চিল্লাতে ছুটছে, তার আগে আগে ছুটছে একটা লোক। সেই চোর। আমার ডিউটি থাকলে নিশ্চয়ই তাকে ধরতাম। এ

হচ্ছে ঐ চোরের স্যাঙাৎ। কাছেই লুকিয়েছিল, পালাবার সময়ে বেটা অন্ধকারে আমাকে ভাল করে দেখতে পাইনি! মনে করেছে আমি পথ চলতি কোন লোক। ভদ্রলোকের হাঁক শুনে ওকে ধরবো। তাই বাঁচার ফন্দি করে আমাকেই ধরেছে। এখন বাছাধনকে যেতে হবে থানায়। তারপর দেখুন না, বেটা ভয়ে কিরকম কাঁপছে। মশায়, চোরের নামে নালিশ শুনে বড়বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আজ একটা হাতে হাতে ধরেছি।"

বলবো কি, ভদ্রলোককে ধরে পাহারাওয়ালার সে কি হম্বিতম্বি। শেষে পাড়ার সকলে মিলে অনেক করে পাহারাওয়ালাকে বোঝাই, উনি চোর নন, বাড়িওয়ালা। এই বাড়ি ওর। আসল চোর পালিয়েছে।

পাহারাওয়ালা বলে, "সে আমি জানি না, তবে আপনারা সকলেই থানায় চলুন।" তার কথায় আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই রাতে এতগুলো লোক থানায় গেলে হয়তো বলবে আমরা থানা আক্রমণ করতে গেছি। সে এক ফ্যাসাদ। ভেড়া যতই নিরীহ হোক তার পাল দেখলে সবাই সরে দাঁড়ায়।

যাহোক পাহারাওয়ালা লোকটা ভাল ছিল, আমাদের কথা শেষ অবধি বুঝে ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে বলে "বাবু চোর ধরা সহজ নয়, তাহলে সরকার এত থানা-পুলিশ রাখতো না।"

কথায় সায় দিয়ে সবাই বলে, "ঠিক! ঠিক।"

ভদ্রলোকও সেদিন সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করেন, 'চোর সর্বস্ব নিয়ে গেলেও আর ধরচি না।' এই শুনে কিন্তু আমার মনে তড়াক করে একটি কথা লাফিয়ে ওঠে, 'চোর ধরা অতি সহজ, চোর ধরতেই হবে।'

একটা প্ল্যান ঠিক করে পাড়ার সকলকে বলতেই প্রত্যেকই এক কথা বলে "সারাদিন খেটে রাতে কোথায় একটু ঘুমোবো, তা নয়, পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াও। পুলিশ আছে কি করতে?"

তাদের কথায় আমার জিদ আরও বাড়ে। রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটি সকলেরই নিশ্চিত জানা আছে—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে।'

ঠিক করলাম, একটি চোর ধরবো। সকলে মিলে বীর হওয়া যায় না, বীর হয় একজন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড। বলতেও দুঃখ হয়, ঐ যে দোতলা বাড়িটা যার জানালায় নীল পর্দা, ঐ বাড়ির ছোট ছেলেটির সিনেমা দেখা আর হিন্দী গান শোনার খুব বাতিক। বাড়িতে রেডিও থেকে দিনরাত মেশিনগানের গুলির ঝাঁকের মতো হিন্দীগান বেরিয়ে আসছে। বাড়ীর লোকেরা তাতে আধমরা।

বাড়ীটা তখন মেরামত করা হচ্ছে। পাঁচিলের পাশে চুণ-বালি আর ইটের গাদা। সেদিন রাতে মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছি। দূরে কারখানার ঘড়িতে ঠং ঠং করে বারোটা বেজে গেছে। একটা বাজে বাজে, হঠাৎ ঐ বাড়ীর ভেতর থেকে উঠলো বিকট আর্তনাদ, 'ওরে বাবারে—মেরে ফেললে রে—আর করবো না রে –'

কয়েক লাফে বাড়ীটার সদর দরজায় পৌঁছে ধুম্ ধুম্ করে ধাক্কা দিই আর চিৎকার করে বলি, "ভয় নেই—ভয় নেই। দরজা খুলুন।"

সেই আর্তনাদে আর আমার চীৎকারে চারধার থেকে পাড়ার লোকেরা ছুটে আসতে লাগলো। সকলেরই ধারণা বাড়ীর মধ্যে ডাকাত ঢুকে বাড়ির কাউকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। দরজা খুললে নিশ্চয় একটা বীভৎস দৃশ্য দেখা যাবে। কিন্তু ডাকাতেরা যেন না পালায়। সকলকে বাড়িটাকে ঘিরে সতর্ক হয়ে থাকতে বললাম। বললে কি হবে? সাহস করে কেউ দাঁড়াতে চায় না, তাও খালি হাতে। সকলেই সদর দরজায় আমার সঙ্গে থাকতে চায়। এমন সময়ে ভিতর থেকে দরজা খুলতেই আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে যে দৃশ্য দেখি তাতে সকলেই স্তম্ভিত। দেখি কি, বাড়ির ছোট ছেলেটি উঠোনে পড়ে, চুন-সুরকিতে তার জামা-কাপড়, মুখ-মাথা মাখামাখি। তার মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝে নিলাম। নাইট-শোতে সিনেমা দেখে পাঁচীল টপকে বাড়ীতে ঢোকার ফলেই তার ঐ শোচনীয় অবস্থা। বাড়ির লোকে চোর মনে করে আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে। তবে উভয়েরই খুব শিক্ষা হলো।

সকালে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ বাড়ির দোতালা থেকে বড় ভাই চিৎকার করে ওঠেন, "আমার রেডিও সেট নেই। চোরে নিয়ে পালিয়েছে। কি সর্বনাশ হলো।"

আবার সকলে অবাক।

সেই হট্টগোলের সুযোগে সত্যিকারের চোরও আমাদের সঙ্গে ঢুকে পড়ে কাজ গুছিয়ে সরে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র সর্বক্ষণই চোর ঘুরছে। শুনলাম রেডিও সেটটি ছিল বেশ দামী, ভদ্রলোক সখ করে কিনেছিলেন। শুনে সকলেরই দুঃখ হলো। সে রাতের ঐ দুঃখময় ঘটনার জন্যে দায়ী ঐ ছোট ছেলেটিকে ছাড়া আর কাকে বলা যায়। যদিও বেচারা মার খেয়ে ধরাশায়ী। কি আর করা যাবে? সকলে হতাশের মতো বেরিয়ে এলাম।

এবার আমার চোর ধরার ঘটনাটা বলি যার জন্যে কাগজে আমার ছবি ছাপা আর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, একটা মেডেল পেয়েছি। ফুলের মালা? সেও পেয়েছি। আগেই বলেছি চোর ধরা খুবই সহজ। মনে রাখতে হবে, চোর আর গৃহস্থ পরস্পরকে ভয় করে, কিন্তু ঘটনার ফেরে বেপরোয়া হয়ে উঠে একটা কাণ্ড করে বসে।

সেই অন্ধকার রাতখানা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের এদিকে আবার প্রায়ই বিদ্যুৎ-প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সারারাতের মধ্যে রাস্তার আলোগুলো আর জ্বলে না। এমন রাতে চোর-ডাকাতের ভারি মজা। সে রাতেও রাত এগারোটার পর হঠাৎ আলো নিভে গেল। চারধারে গাঢ় অন্ধকার, তার ওপর অমাবস্যা আকাশভরা মেঘ। একটু একটু ঝড়ো বাতাস বইছে। বৃষ্টি হতে পারে মনে করে রাত বারোটা বাজতেই হাতে ছাতা, পায়ে বাটার জুতো পরে বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টিতে ছাতা যেমন মাথা রক্ষা করবে, তেমনি দরকার হলে তার সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পারবো। আর আরামদায়ক জুতো জোড়ার দরুণ নিঃশব্দে লঘুপায় চলাফেরা করতে পারা যাবে।

নিঃশব্দেই টহল দিচ্ছি। জনহীন পথ। বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে পথের দু'পাশে জমাট রহস্যের মতো। দু' একটা কুকুর ডেকে উঠছে, এছাড়া আর কিছু নেই। পথের শেষে ভড়েদের তেতালা দেখা যায়। ওদের আবার সেদিন এক গা গয়না পরে নতুন বৌ এসেছে। কাজেই চোরের সেদিকে চোখ পড়বে তাতে আশ্চর্যের কি? আমি তাই বাড়িটার দিকে নজর রেখেছি। কিন্তু রাত দুটো অবধি কোথাও কিছু চোখে পড়লো না। ভড়েদের বাড়ির সামনে কয়েকবার টহল দিয়ে খাঁড়াদের বাড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়েছি কি এমনি পিছনে 'চোর চোর' বলে চিৎকার আর রাস্তার আলোগুলো কে

যেন তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়ে দিল। সেই আলোতে দেখলাম একটা লোক মাথায় নূতন সুটকেশ নিয়ে আমার পাশ দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বুঝতে বাকী রইল না, লোকটা চুরি করে পালাচ্ছে। আমিও 'চোর চোর' বলতে বলতে তার পিছু ছুটলাম। মনে করলাম, এখনই চারধার থেকে লোকজন বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার বদলে হঠাৎ একটা ঠং ঠং আওয়াজ আর লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সুটকেশটা ছিটকে গেল একদিকে। আমিও ততক্ষণে তার এত কাছে গিয়ে পড়েছিলাম যে তার গায়ে হোঁচট খেয়ে তার ঘাড়ের উপর পড়লাম। সেও কোমর থেকে ছোরা বের করে দিলে আমার হাতে বসিয়ে, এই যে তার প্রমাণ কাটা দাগ। উঃ সে কি রক্ত। সে উঠতে যাবে এমন সময়ে কে এসে তাকে চেপে ধরে ছোরা ছিনিয়ে নিল। লোকজনও ততক্ষণে এসে পড়লো অনেক। তারপরে চোরের আর আমার যা অবস্থা হলো! চোরকে চাঁদা করে পেটে আর আমার পিঠ চাপড়ে বলে 'সাবাস'।

একজন বললে, "নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে চোরটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ধরেছে।"

আর একজন বললে, "পাহারাওয়ালা বলছে, ও নাকি আগে লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল, তাতেই চোরটা মাটিতে পড়ে গেছে। বললেই হলো? পুলিশ কোনদিন চোর ধরেছে?"

আর একজন বললে, "আমাদের বিপিন না থাকলে ভড়েদের দশ হাজার টাকা গিয়েছিল আর কি। সাবাস বিপিন! আর ও যে বলেছে লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল, তার মানে কি ও আগে চোর ধরেছে? কভি নেই। চোর ধরেছে আমাদের বিপিন, লাঠি ছুঁড়েছে ও সাহস বিপিনের, কারদানি ওর। বিপিন আমাদের গৌরব, বীরত্বের জীবন্ত চেহারা। সাবাস্।"

আবার পিঠে থাপ্পড়।

কাছেই ডাক্তারখানা। ডাক্তারবাবু আমার প্রাথমিক চিকিৎসা করে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। চোরের সঙ্গে আমরা সকলেই থানায় গেলাম। কেস লেখার সময়ে বড়বাবু মন্তব্য করলেন, 'চোর ধরেছে বিপিনবিহারী সরখেল।'

পরদিন কাগজে 'যুবকের বীরত্ব' শিরোনামায় আমার ছবি আর চোর ধরার সবিস্তার কাহিনী ছাপা হলো। পাহারাওয়ালাটার কথা ভুলেও লিখলো না। আমিও ভেবে দেখলাম, পাহারাওয়ালা যাই করুক আমি না এলে চোরটা

ধরাই পড়ত না, উঠে পালাত। আপনারা কি বলেন? বাহাদুরি আমার নয়?" বলে বিপিনবিহারী সকলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

একজন বলে, "লোকটা ফোর-টোয়েন্টি। চোরটা পাহারাওলার লাঠি লেগে না পড়লে—"

আর একজন বলে, "আরে শুনলেই তো লোকটা হোঁচট খেয়ে চোরটার ঘাড়ে পড়েছিল, তার মানে কি ধরা?"

তৃতীয় জন বলে, "কিন্তু কাগজে যে লিখেছে—"

"রাখুন আপনার কাগজ, ছাগলে কি না খায় কাগজে কি না লেখে? ওর কেউ কাগজে কাজ করে বোধ হয়।"

চতুর্থজন বলে, "আচ্ছা মশায়, সেই পাহারাওলাটার পদোন্নতি হয়েছিল কি?"

বিপিনবিহারী জিভে ক্যাক করে শব্দ করে বলে, "সে ধিক্কার দিয়ে চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে ঐ যে তেলেভাজার দোকান করেছে। স্বাধীন ব্যবসা। আর চোর তো ধরেছি আমি।"

সকলে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে চলে যায়। কিন্তু সেই ছেলে দুটি গলা ধরাধরি করে বিপিনবিহারীর বীরত্বব্যঞ্জক মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।



শঙ্খিনীর পাক

তারিণী বাবু বললেন,—"হুজুর, এ অঞ্চলে যে কাহিনীটা প্রচলিত আছে সেটা আপনার কাছে নিবেদন করছি।

এই শঙ্খিনী নদীর এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ ভাটিতে একখানা গ্রাম ছিল। ঘটনাটা যেদিনকার সেদিন দুপুরে ঐ গ্রামের সাধুচরণের ছোট ভাইয়ের ছেলে বৃন্দাবন ক্ষেত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে,—"শীগ্‌গির পালাও—শীগ্‌গির। পশ্চিম দিক ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে!"

খবরটা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মত সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তারা পালাবে কোথায়? গ্রামের তিন দিক জুড়ে ক্ষেত ও মাঠ, একদিকে এই নদী শঙ্খিনী।

বর্গীরা আসছে ঘোড়ায়।

কয়েকজন গ্রামের বাইরে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে পশ্চিম দিকটা লক্ষ্য করতে লাগল। হাঁ, ঐ—দূরে ধুলো উড়ছে। একজন সেখানে শুয়ে মাটিতে কান দিয়ে শুনলে। শব্দ হচ্ছে দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌। বোধ হয় একসঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী আসছে।

তারা আর কেউ দাঁড়াল না, 'পালাও পালাও—' বলে চীৎকার করতে করতে গ্রামের ভেতর ছুটল। সকলের একমাত্র ভরসা শঙ্খিনী নদী। নদীর ও-পারে কিছুদূরে খানিকটা জলা। তার চারধারে ঘন শরবন। নদীটা সাঁতরে পার হয়ে বনটার মধ্যে গা-ঢাকা দিলে প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে সময়ও লাগবে অনেক।

সকলে ঘর-বাড়ী ফেলে নদীর দিকে ছুটল। শিশু ও নারীরা ভয়ে কাঁদছে। বৃদ্ধেরাও প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লাগল। বর্গীরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ—কারুকেই নিষ্কৃতি দেয় না। তারা যদি কেবল যুবক ও প্রৌঢ়দের ওপর অত্যাচার করত! কি ঘোর অন্যায়!

দেখতে দেখতে শঙ্খিনীর তীরে ভয়ার্ত গ্রামবাসীদের ভীড় জমে গেল। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ও-পারের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পরাণও গেল তাদের সঙ্গে।

ঘাটে তিন-চারখানা ডিঙি ছিল। যাদের ডিঙি তারা আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে ডিঙিতে উঠে ও-পারে রওনা হ'ল।

সাধুচরণের মেয়ে ভবানী তখনও কাঁদছে। সাধুচরণ দেখলে, তাদের দু'জনের পালাবার উপায় নেই। এ বয়সে সে আর শঙ্খিনী সাঁতরে পার হ'তে পারবে না। ভবানী গ্রামের মেয়ে; সাঁতার জানে বটে কিন্তু নদী পার হবার শক্তি তার নেই। সিকি ভাগ গিয়েই সে তলিয়ে যাবে। পালাবারও শক্তি চাই।

সে ভবানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—"কাঁদিস নে। ভয় নেই, চল্ আমার সঙ্গে।"

তখনও অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তারা যখন দেখলে, নদী পার হবার আর কোনই উপায় নেই, তখন নদীর তীর ধ'রে ছুটতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায়? ক্ষেতগুলিতে তখন ধানগাছের ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে মাত্র। তারা আশ্রয় দিতে পারে না, নিজেরাই পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ-ভিক্ষা করে।

ভবানীর এক হাত ধ'রে সাধুচরণ তাকে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। 'ভবানীরও মনে সাহস এল। সে আর এক হাতে চোখের জল মুছল।

যেতে যেতে সাধুচরণ বললে,—"আমি বুড়ো মানুষ, ওদের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করে নেব। কিন্তু ভয় তোর জন্যে। তোকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। হয়ত আমার চোখের সামনেই তোকে কেটে ফেলবে, কি আগুনে পোড়াবে।"

সাধুচরণের গলা ধরে এল। ভবানীর বয়স দশ বছর। দেখতে চমৎকার। সাধুচরণ ঠিক করেছিল, সেবারই বিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হল।

বাপের কথাগুলো শুনতে শুনতে ভবানী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সাধুচরণ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল—"কাঁদিস নে। তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব—"

ভবানী বল্লে,—"আর তুমি?"

"আমি কিছু দূরে বসে তোকে পাহারা দেব। ওরা চলে গেলে তোকে সেখান থেকে বার করে নেব। ঐ যে আমাদের বাড়ী।"

সেখান থেকে গ্রামের বাইরেটা দেখা যায়। সাধুচরণ ভবানীর হাত ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকটায় তাকিয়ে দেখতে লাগল। ধূ-ধূ করছে মাঠ। আর ঐ ধুলো উড়ছে, যেন কাল মেঘ!

সে ভবানীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে বললে,—"তুই এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।"

ভবানী বাপের কথামত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুচরণ বড় ঘরখানার বারান্দায় উঠে গেল। একধারে একখানা কোদাল ছিল। সাধুচরণ সেখানা হাতে নিয়ে উঠোন দিয়ে ঘরের পিছনে বাগানের দিকে চলে গেল। তারপরই সে শুনতে পেল মাটি কাটার শব্দ হচ্ছে—ধপ্—ধপ্।

কিছুক্ষণ পরে সাধুচরণ ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রান্নাঘরে উঠে গেল। তারপর চালশুদ্ধ বড় ডোলটা মেঝেতে উপুড় করে ফেলে সেটা খালি ক'রে টানতে টানতে উঠোনে নামিয়ে ভবানীকে বল্লে,—"আয় আমার সঙ্গে।"

ভবানী তার পিছন পিছন গিয়ে দেখে, ঘর থেকে হাত চার-পাঁচ দূরে যে গর্তটা ছিল সাধুচরণ সেটাকে কোদাল দিয়ে কেটে আরও বড় ও আরও গভীর করেছে।

সাধুচরণ গর্তের ধারে এসে বল্লে,—"এইখানে দাঁড়া। ঐ ঘোড়ার পায়ের

শব্দ শোনা যাচ্ছে না?" ব'লেই সে ডোলটা গর্তর মধ্যে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করলে—"এটা দিয়ে কি করবে?"

"তোর ঘর। ভয় নেই। তুই শীগ্‌গির ওর মধ্যে নেমে গিয়ে বস্। আমি দু'খানা তক্তা আনছি। যা শীগ্‌গির। ঐ শব্দ শোনা যাচ্ছে।" বলতে বলতে সাধুচরণ ভবানীকে হাত ধ'রে টেনে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিলে।

ভবানী ডোলটার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাধুচরণ ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'খানা তক্তা এনে বললে,—"বস্—বস্ ভয় নেই। আমি তোর বাপ। তুই আমার বড় আদরের জিনিস। আমার আর কেউ নেই। ডাকাতগুলোর কাছ থেকে লুকিয়ে না রাখলে আবার তোকে তুলে নেবে। বস্ -বস্—"

বর্গীবাহিনী তখন মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা দিয়েছে।

ভবানী ভয়ে ডোলটার মধ্যে জড়সড় হয়ে বসতেই সাধুচরণ ডোলের মুখ তক্তা দু'খানা দিয়ে বন্ধ করে দিলে। কেবল বাতাস যাবার জন্য আঙুল চারেক ফাঁক রইল। তারপর সাধু সেই তক্তা দু'খানার ওপর ক্ষিপ্র হাতে মাটি চাপা দিতে লাগল, আর তক্তার ফাঁকে মুখ রেখে মাঝে মাঝে বলতে লাগল,—"নড়িস্ নে, শব্দ করিস্ নে"

মাটি দেওয়া হয়ে গেলে চারপাশ থেকে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে সাধুচরণ সেগুলোকে মাটির ওপর চাপা দিলে। তারপর তক্তার ফাঁক-বরাবর মুখ রেখে বললে,—"ভবানী, ভয় নেই। ওরা চলে গেলেই তোকে তুলব। আমি কাছেই রইলাম।"

মাটির নীচে থেকে চাপা আওয়াজ উঠ্‌ল,—"আমাকে শীগ্‌গির তুলে নিও বাবা!"

"আচ্ছা—" বলেই সাধুচরণ কোদালখানা বাগানের কোণে ভাঁট-জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর গিয়ে হাত-পা ধুয়ে, গামছা দিয়ে মুছে, ঘরে ঢুকে কাপড়-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তার একটু পরেই বর্গীবাহিনী গ্রামে এসে ঢুকল। জনশূন্য গ্রামে বর্গীরা বাড়ীতে বাড়ীতে ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। জিনিসপত্র উল্টে, বাসন-তৈজস ও সিন্দুক-চৌকি ভেঙে, গোলা-মরাই কেটে, কাপড়-বিছানা ছিঁড়ে, শস্য ছড়িয়ে, জায়গায় জায়গায় মাটি খুঁড়ে, নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ

করতে লাগল। জন চারেক সাধুচরণের ঘরে ঢুকল। একজন বিনা বাক্য ব্যয়ে বর্শার আগা দিয়ে তার গা থেকে কাপড়খানা তুলে নিল। একজন তার কাঁধে তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে বললে,—"রূপেয়া—"

সাধুচরণের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে তবুও শুয়ে শুয়ে হাতজোড় করে বললে,—"বাবারা, বুড়োমানুষ আমি। বড় অসুখ। আমার কিছুই নেই—।"

বর্গীরা তবুও কথা শোনে না ; তারা দয়া-মায়াহীন। একজন সাধুচরণের পাঁজরায় বর্শার একটা খোঁচা দিয়ে চড়া গলায় বললে,—"রূপেয়া—"

আর একজন সাধুচরণের যন্ত্রণা আর না বাড়িয়ে তলোয়ারের এক কোপে মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। বাকী সকলে 'হা-হা' করে হেসে উঠল।

তারপর তারা সাধুচরণের ঘরখানা বেশ ভাল করে খুঁজে বেরিয়ে এল। কোথাও কিছু পেল না। সেই সময় বর্গীবাহিনীর অধিনায়কের তুর্য গম্ভীর শব্দে বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ বর্গীরা ঘোড়ায় উঠে মশাল জ্বালিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সাপের মত ফণা তুলে অগ্নিশিখা ঘরের চালে চালে নাচতে লাগল। বর্গীরাও আর দাঁড়াল না, শঙ্খিনীর তীর ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। সেদিকে যারা পালিয়েছিল, বর্গীরা তাদের সকলকেই হত্যা করল।

এদিকে সারা গ্রাম পুড়ছে। ধোঁয়ায় আকাশ কালো। হঠাৎ চাল থেকে এক লাফে ভবানীর গর্তটার মুখে শুকনো ডালপালার ওপর পড়ে আগুনটা চারধারে ছড়িয়ে গেল। ভবানী সেই সময়ে ভয়ে আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠল,—"বাবা গো, আমায় তুলে নাও। ও বাবা—বাবা গো—!"

সাধুচরণের দেহটি তখন পুড়ছে।

ভবানীর শেষ ডাকটি মিলাতে না মিলাতে তার পাশের ঘরখানার জ্বলন্ত চাল গর্তটার ওপর ভেঙে পড়ে শব্দটাকে যেন মাটির সঙ্গে চেপে ধরল।

এই ঘটনা প্রায় দু'শ বছর আগেকার। শঙ্খিনীও পথ বদলে সেই গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে চলছে এবং সেখানে একটি বড় পাক দেখা যায়। যেসব নৌকো নিশীথ রাতে ঐখান দিয়ে যায় তাদের দাঁড়ি-মাঝিরা শুনতে পায়, পাকের মধ্যে থেকে যেন শব্দ উঠছে—'বাবা গো, আমায় তুলে নাও। ও বাবা—বাবা গো—!'

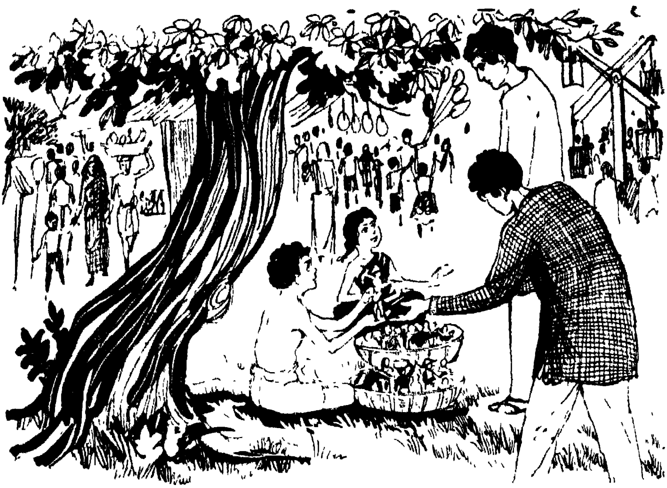
এই শব্দ আমিও শুনেছি।

শেষের শব্দটা অবশ্য স্পষ্ট হয় না, জলধারার শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। এই কারণে একটু রাত হলেই শঙ্খিনীর পাকের পাশ দিয়ে কোন নৌকো যেতে চায় না।

এখন মাঝিদের ওপর আপনার যা হুকুম হয়।"

বললাম,—"অগত্যা রাতটা এখানেই কাটাব।"

তারিণীবাবুরা আমার কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু খুশী হলেন কি না বলতে পারি না। সে রাতে চোখের পাতা দুটো একবারও বন্ধ করতে পারলাম না; শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—'সত্যিই কি ঐ পাকের নীচে আজও ভবানীর দেহাবশেষ আছে?'



ছেলেটা

লোকটি মাটির খেলনা পুতুল গড়ে। তার ছেলেটা সেগুলোর গায়ে রং লাগায়। সেও বাপের মতো খেলনা পুতুল গড়তে শিখেচে।

বাপ ছেলের গড়া খেলনা-পুতুলগুলো দেখে বলে—"হাত সাফা। কিন্তু এ কাজে পেট ভরবে না রে বাপ।"

ছেলেটা বাপের সঙ্গে মেলায় মেলায় ঘোরে—রথের মেলায় চড়কের মেলায়, দুর্গাপুজোর মেলায়। দু' ক্রোশ, চার ক্রোশ কখন কখন তারও চেয়ে দূরে যায়। সে ভিন গাঁ দেখে, শহর দেখে আর দেখে মানুষজন। কাজেই অল্প বয়সেই চালাক হয়ে উঠেছে।

বাপের কথা শুনে বলে—"কোন কাজে পেট ভরে? সবাই বলে ভরে না, দিন চলে না।"

বাপ উত্তর দেয় না, হাতের আঠালো মাটির গুলিটাতে আঙুলের চাপ দিতেই সেটা সাপের মতো ফণা তোলে, আজ তার কাজে মন বসে না। গুলিটা মাটির বড় তালটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেকে বলে—"এক ছিলিম তামাক সাজ দিনি।"

ছেলে তামাক সাজতে সাজতে বলে—"ওরা বলে গাজির মেলায় নাকি কারবার ভাল হয়। কলকেতা থেকে মোটরে চড়ে শৌখিন বাবুরা আসে, ব্যাপারীরাও আসে। তারা চড়া দামে মাল কেনে—পয়সার পরোয়া করে না।"

বাপ বলে—"মালটা যদি চোখে ধরে তবেই তো। ঐ সব জিনিস—"

ছেলে বাপের হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে বলে—"খদ্দেররা আর পাঁচটা রেখে তোমার পুতুল-খেলনা কেনে কি এমনিই? আচ্ছা, তুমি ঠাকুর গড়না কেন? ওতে তো অনেক পয়সা।"

বাপ জবাব দেয় না, বেড়ায় ঠেসান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে হুঁকো টানে।

ছেলে পুতুল গড়ে, সারস। সারসটা একখানা ঠ্যাং উঁচু করে আছে আর ঠোঁট ফাঁক করে একটা মাছ গিলছে।

বাপ বলে—"ও পুতুল লোকে নেবে? মানুষ গড়, ঠাকুর-দেবতা গড়—"

ছেলে জবাব দেয়, বলে—"ও সব মরা। মরা গড়তে ভাল লাগে না। তুমি বুড়ো মানুষ। তুমি গড়।"

এমনই করে বাপ বেটায় কথা-বার্তা চলে, কাজ করে। পরদিন ছেলেটা গড়ে জোয়াল কাঁধে বলদ, তার পিছনে লাঙ্গলের মুঠি ধরে মাথাল মাথায় চাষী। তার ডান হাতখানা তোলা, একখানা লকড়ি ধরে আছে; সবটা মিলিয়ে একটা গতি—এগিয়ে চলার। দেখে বাপ কেমন হয়ে যায়।

সে বলে—"এ কিরে খোকা? চাষার মূর্তি কে নেবে?"

ছেলেটা বলে—"বাবুরা।"

"তুই দেখচি না খেয়ে মরবি। ঠাকুর-দেবতা গড়। খেতে পাবি। আর ঐ যে নেতা ঠাকুর, বিবেক ঠাকুর, ও সব ঝটপট বিকোয়। মন দিয়ে গড় দিনি। তোর হাত ভাল। ও বয়সে আমিও অমন পারতাম না। তোর ঠাকুরদা বকতো। খেলায় মন ছিল।"

ছেলে বলে—"সব কারিগর ওসব গড়ে। যা ওরা গড়তে চায় না আমি তাই গড়বো। সামনে রথ। যাবো সহেলি নদীর ওপারে টুমটুমায়।"

বাপ বলে—"সে কি এখানে? যার নাম যেতে আসতে আট কোশ। আমি পারবো না বাছা।"

ছেলে বলে—"তোমাকে কি যাবার কথা কইছি? ঘরে থেকো। আমি যাব, সুরো যাবে, ফুলমতী যাবে। ওদের মামা যাবে।"

সকলের ঘর পাশাপাশি। ওরা সকলে পুতুল-খেলনা গড়ে, পসরা নিয়ে হাটে গঞ্জে, মেলায় যায়, সবাই গরিব। কারো নিজের একটু জমি আছে, কেউ বা পরের জমি চাষ করে। বাকি সময় ঐ মাটির কাজ করে।

ওরা জাত শিল্পী। ভাঙা ঘরের উঠোন ওদের কারখানা। এক কোণে জমানো মাটি। বাঁশের চটা এ ছুরি, ওদের হাতিয়ার। ওগুলো ছাড়াও নানা মাল-মশলা আছে; খুরিতে খুরিতে রং লাল, নীল, কালো, সাদা, সোনালী গোটা দুই তুলি, ভাঁড় ভরা জল।

বাপ বলে—"তোর যা মন চায় কর। আমি আর ক' দিন?"

ছেলে বাপের একেবারে কাছে সরে এসে গা ঘেঁসে বসে, বলে—"তোমার ও কথা আমার ভাল লাগে না।"

তার চোখ দুটো ছলছল করে। বাপ ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, হেসে বলে—"মরণ-বাঁচন কি কারো ইচ্ছেয় হয়? তোর ভালর তরেই বলি! নে কাজ ধর। কি গড়বি?"

ছেলে বলে—"কামার।"

"তাই গড়।"

কয়েক দিনে ছেলেটা গড়ে তোলে কামার, বৈঠা হাতে নৌকোর মাঝি, চরকা কাটা বুড়ি, ঢুলি, ঢাকী, মোট মাথায় মুটে। সব পুতুলে গতি।

সকলে কাজ করছে।

সেদিন ওরা চারজনে সহেলী নদীর খেয়াঘাটে বসে আছে নিজের নিজের পুতুল ভরা, ময়লা কাপড় ঢাকা ঝুড়ি সামনে রেখে। ওপার থেকে সওয়ারি নিয়ে খেয়া আসচে। আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশ, নতুন জল থৈ থৈ সহেলী নদী, এপার-ওপার গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল মাঠ ভিজে ভিজে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ফুলমতী বলে—"আর যেন দেয়া না আসে।"

পাশ থেকে একজন বলে ওঠে—"তুই দেখিস নিজেরটা। এদিকে জল বিনে চাষী মরে। ধান না হলে খাবি কি?"

সকলে দেখে মনোহর কুইতি। কখন এসে পাশে বসেছে। মনোহরও চলেছে হাটে একজোড়া কাঁঠাল নিয়ে।

ফুলমতী বলে—"পুতুলগুলো না বেচত্তি পারি যদি চাল বা কিনবো কি দে?"

মনোহর বলে—"তাই তো বলি, লোকে দেখে নিজেরটা।"

ওদের মামা মনোহরকে দেখতে পারে না: বলে—"তুমি নিজের বেলায় আঁটি-সুঁটি নয়?"

মনোহর নড়ে বসে, কাঁঠালে ভরা ধামাটা টেনে সরিয়ে নেয়। ওদের

দু'জনের বাড়ির মাঝখানে ছোট একটা বাঁশঝাড়। আজকালকার দিনে একটা বাঁশঝাড় মানে "জ্যান্ত টাকা।" দু'জনে ওটার দখল নিয়ে বিবাদ কিন্তু পাট্টা কবুলতি কারো ঘরে নেই। কেউ প্রমাণ করতে পারে না, ঝাড়টা কার। মনোহর বলে—"তোর সঙ্গে কে কথা কয়?"

মামা বলে—"তুই মেয়েছেলের সঙ্গে কেজে নেগেছিস!"

ততক্ষণে দুটি একটি করে যাত্রী জড় হয়েছিল। মামার কথা শুনে তারা হো হো করে হাসে। একজন রস দিয়ে বলে, "ভারি সমত্ত মেয়ে গো। বয়েসটা এক কুড়ির আধখানা। তার সঙ্গে কেজে!"

আবার সকলে হাসে। মামা দমে যায়, মনোহর জোর পায়। বলে—"পায়ে পা বাধিয়ে কোঁদোল।"

মামা রুখে দাঁড়ায়, বলে—"মুখ সামলে কথা ক—"

একজন যাত্রী বলে—"আরে, তোমরা নাগালে কী, থামো, থামো।"

ইতিমধ্যে খেয়া নৌকো ঘাটে ভেড়ে। ওপারের যাত্রী নামে, এপারের যাত্রী ওঠে। খেয়া আবার কূল ছেড়ে চলে।

ওপারের ঘাট থেকে গাজির মেলা পাকা দেড় ক্রোশ। মেলার 'থানে' মস্ত দীঘি, তার একধারে দরগা। জায়গাটা ডাঙা জমি, বছরে একবার মেলা বসে। কয়েকটা কয়েৎবেল, আম, একটা বট আর গোটা কয়েক তাল ও খেজুর গাছ চারধারে এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্ষেত, ক্ষেতের পর ক্ষেত, দূরে গাঁ। একটা কাঁচাপাকা রাস্তা সেখান থেকে চলে গেচে। তার আধক্রোশের মাথায় রেল স্টেশন। সেখান থেকে গুমটি পার হয়ে ক্রোশটাক পূবে সহরে সেঁধিয়েছে। গাজি সাহেব ও এই মেলার একটা ইতিহাস বা কাহিনী আছে। কিন্তু তাতে আমাদের দরকার নেই। খেয়া পারঘাটে ভিড়তেই সকলে নেমে পড়ে। ফুলমতী টাল সামলাতে পারে না। ছেলেটা তাকে ধরে ফেলে। না ধরলে বেচারীর সব যেত জলে। ওরা চলেচে সার বেঁধে। পথে রোদ ওঠে—আষাঢ়ে রোদ, কড়া, গা-জ্বালানো, চাঁদী ফাটানো। চলতে চলতে ঘামে শরীর ভিজে যায়, রগ বেয়ে, কপাল বেয়ে পড়ে। ফুলমতী ছেলেটাকে বলে, "আর কত দূর?"

ওর কপালের ওপর কটাসে চুলগুলো ঘামে লেপটে পড়ে আছে, নাক-ছাবিটা চিক চিক করচে। রগ বেয়ে ঘাম ঝরচে। ও নতুন এসেচে এ পথে। কে জানতো এতো দূর? ময়লা আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মোছে।

ছেলেটা বলে—"ঐ যে সাদা দেখা যায়—আওয়াজ শুনচিস? কল্‌কল্‌ করচে যেন পাথার।"

ফুলমতী ঢোক গিলে বলে—"তেস্টায় গলা কাট। ও মামা—"

মামা বলে—"এই পৌঁছে গেচি—পা চালিয়ে আয়।"

কিন্তু পা যে চলে না, মাথায় ভারি বেসাতি।

শেষ অবধি তারা পৌঁছয়। ওঃ! কী ভীড়! এখানে-সেখানে গরুর গাড়ি, মোটর গাড়ি, পা-গাড়ি, পা-রিকসো, ঘোড়া। কত দোকান-বাজার! কিন্তু জল কৈ? দীঘির জল খাওয়া মানা।

মামা বলে—"ঐ যেন একটা টিউকল, চ—চ—"

ফুলমতী বলে—"আগে জায়গা দখল করো—"

হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি একজন হেঁকে বলে, "এই, মাথায় কী?"

ছেলেটা বলে—"মাটির খেলনা—"

"ঐ ধারে—ঐ বটতলায় যা। কোথাকের লোক তোরা?" লোকটা ইজারাদারের পিয়াদা।

ওরা জবাব দেয়, "হৈ নীলপুর—" এবং তাড়াতাড়ি বটতলায় গিয়ে একটা জায়গা দখল করে বসে।

যারা আগে বসেছিল তারা আপত্তি করে। একজন মামাকে ঠেলা দেয়। মামা বলে—"মগের মুলুক নাকি? খাজনা দেব, বসবো। পিয়াদার হুকুম—"

ওরাও খেলনা পুতুল এনেচে।

ফুলমতী বলে—"মামা গো, একটু জল বিনে মরি যে—"

আগে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে বুড়ো লোকটা বলে—"ঐ টিউকল। ঐ লোকের হুড়োহুড়ি। সবাই জল চায়—"

ফুলমতী যায় সে দিকে, ছেলেটাও উঠে যেতে যেতে বলে—"মামা, দেখগো—"

ওরা মুখে-মাথায় জল দিয়ে, পেট ভরে জল খেয়ে ফিরে আসে। এরা যায়। দোকান সাজায় চারজনে। মামা ছেলেটাকে বলে—"তোর ওসব কিরে?" হাসে।

ছেলেটা জবাব দেয় না; ময়লা কাপড় বিছিয়ে তার পুতুলগুলো সাজায়, সে ফুলমতীর পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারে না—সব মেয়ে ছেলে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ছেলে কোলে মা, পসারিণী, গোয়ালিনী মাথায়

দুধের কেঁড়ে, ঘাগরা পরা ইস্কুলের মেয়ে, পাশে ছোট ভাই। খদ্দের আসে দেখে দাম জিজ্ঞেস করে, কেনে না। পুতুল-খেলনা, সৌখিন সওদা কেনবার লোক মেলায় যেন নেই। খাবারের দোকানের সামনে, তেলেভাজার দোকানের সামনে, মুড়ি বাতাসার দোকানের সামনে যত খদ্দেরের ভিড়। ওরা খেতে চায়। মানুষের ক্ষুধাই প্রধান। আম-কাঁঠাল, পেয়ারা-জামরুল আনারসের বেসাতি নিয়ে যারা এসেচে তারাও ওদের মতো দু'পয়সা করচে। আর বিকচ্চে চাল—তিন টাকা কে, জি। কেউ কেউ বেচচে দু'টাকা বাষট্টি পয়সায়। যারা এই রহস্য জানে তারা কিনচে না। ও চাল জলে ভিজিয়ে ভারি করা। দেশটা খিদেয় জ্বলচে—খাবার চাই, খাবার। ওরা বাঁচতে চায়। জীবনভোর হোক কষ্ট, আসুক দুঃখ, তবু বেঁচে থাকতে চায়।

তাই বলে কি আর কিছু বিকোয় না? বিকোয়। পুতুলগুলোও বিকচ্চে লক্ষ্মী সরস্বতী, সুভাষ ঠাকুর, রবি ঠাকুর, বিবেক ঠাকুর। আর হাতী-হরিণও বিকিয়ে যায়। ছেলেটা উবু হয়ে চুপচাপ বসে আছে। তার শিল্প কেউ কেনে না, সবাই দেখে। ফুলমতীর ঠাকুর-দেবতাগুলো বিকিয়েছে, আর কিছু নয়।

ছেলেটা ভাবে, "বাপ ঠিকই বলেচে। কেউ কিনবে না।"

এমন সময় আসে ট্রাউজার পরা হাফসার্ট গায়ে চার পাঁচটি লোক। ওদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পুতুল খেলনাগুলোকে দেখে যেন তাজ্জব বনে যায়। পরক্ষণেই ছেলেটাকে বলে—"এই সবগুলোর দাম কত? খুকী, তুই কত নিবি?"

ওরা ব্যাপারী, এসেচে কলকাতা থেকে। ওরা মাল চেনে—অভিজাতেরা এই সবই চায়। তারা ঘর সাজায় গ্রাম্যশিল্প দিয়ে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ছেলেটার পুতুলগুলো চোখের সামনে তুলে ধরে তারিফ করে। তারিফ করে ফুলমতীর ছেলেকে দুধ খাওয়ানো মা, পসারিণী, গোয়ালিনী, ইস্কুলের মেয়েটার।

কিন্তু ছেলেটা বা ফুলমতী কেউ জানে না, তাদের মেহনতের দাম, কলা-কৌশলের দাম একত্রে কত? ব্যাপারীরা জানে, বোঝে, বলে—"খোকা, তোর সবগুলো নেব পনের টাকায়।"

ছেলেটা নড়ে-চড়ে বসে। সে মনে মনে হিসাব করে একটার দাম কত হওয়া উচিত। তার পুতুল আছে—হিসেবে বাধা পড়ে। ওরা বলে—"আচ্ছা, আরও এক টাকা—"

ফুলমতী পায় ছ'টাকা। তারা আর কিছু কেনে না, মালগুলো ঝোড়ায়, ওপর নিচে মাঝে বিচালী দিয়ে ঢেকে নিয়ে যায় মেলার বাইরে টেম্‌পোতে।

ছেলেটা আর ফুলমতী খুব খুশী। ফুলমতীর মামাও বেচে কিছু কিছু। মামা বলে—"দিন বদলেচে। মামুলি জিনিস আর চলে না।"

খিদেয় ওদের পেট জ্বলচে, এখন আরও বেশী করে। আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে যায়; দিগন্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়, মেঘ গুড় গুড় করে। বাদলার বাতাস ছুটে আসে। বেলাও পড়ে আসচে, মেলাও ভাঙতে শুরু করেচে।

মুড়ি-চিড়ে বাতাসা ফুরিয়ে গেচে। জিলিপি আর ভাজা হচ্ছে না, খামি নেই। ওরা তেলেভাজা কেনে—বেগুনী, পেঁয়াজী, ফুলুরী, ঝালবড়া খেয়ে জল খায়। চাল কিনতে যায়। চালও নিঃশেষ। এক জায়গায় পায়। তিন টাকা পঁচিশ পয়সা, কে জি। তাই কেনে। কিন্তু এইটুকু চাল ক'দিন চলবে, এই দামে ক'দিন কিনবে? মেলাতো রোজ বসে না! যতটুকু পায়, যেটুকু পায় তাই কিনে পোঁটলা বেঁধে নেয়।

পিয়াদা আসে বলে—"পালাচ্চিস যে! খাজনা কৈ?"

মামা বলে—"একবার নে গেচে।"

"সে তো ভাড়া। জল খেলি, শান্তিতে বসে রইলি তার পয়সা কৈ? চারজনে পঞ্চাশ পয়সা।"

মামা বলে—"চারজনে বার পয়সা করে দিলে হয় দু'পয়সা কম পঞ্চাশ পয়সা—"

পিয়াদা বলে—"আচ্ছা ছ্যাচড়া তো। সবাই দিচ্চে—আরও বেশী দিচ্চে।"

ছেলেটা বলে—"যার যেমন বেসাতী। আমরা গরীব—"

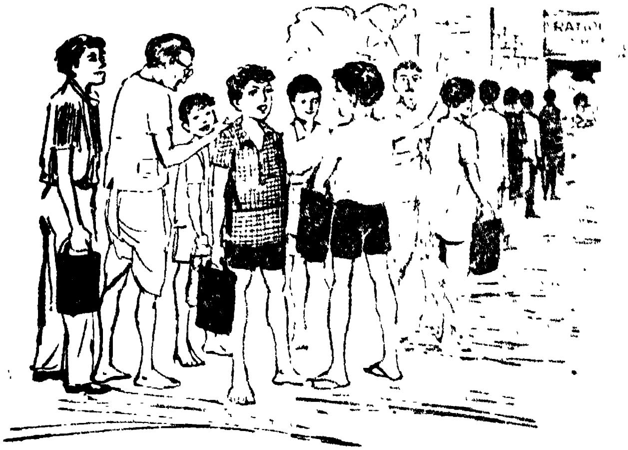
"সবাই গরীব। দে—তাই দে—"

ওরা পয়সা দিয়ে বাড়ির পথ ধরে। কত লোক চলেচে। সকলের মাথাতেই কিছু কিছু সওদা। পথে অন্ধকার নামে, ঝিরি ঝিরি জল ঝরে, ব্যাঙ ডাকে, ঝিঁঝি ডাকে। ঐ দূরে দেখা যায় সহেলীর খেয়াঘাটের আলো, যেন জোনাকী।

ওরা কাজ সেরে ঘরে ফিরে চলে।

ছেলেটা ভাবে তার বাবার কথা—খুশী হবে, বলবে—'খোকা আমার কাল গেছে। এখন তোদের কাল।'

সে পা চালিয়ে চলে—



প্যাঁণ্ডা ও পটকা

ওদের দু'জনের দুটো পোশাকী নামও আছে, কিন্তু আটপৌরে নামেই সর্বত্র পরিচিত। দু'জনে রেশনের দোকানে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলবার। ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেচে, তবু আকাশ থমথমে।

পটকা বললে, "আমার নম্বর চৌদ্দ, এসেচি সাড়ে পাঁচটায়।"

"এখন বোধহয়—ও দাদু, আপনার ঘড়িটা চলচে তো?" বলে প্যাঁণ্ডা তার পিছনের বয়স্ক ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসলো।

পটকা জিগোস করলে, "কটা রে?"

প্যাঁণ্ডা বললে, "আধঘণ্টা আগে দেখেচি সাড়ে সাতটা, এখনও তাই। লাইনও নড়চে না, ঘড়িও চলচে না। দাদু হাতটা ঝাঁকি দিন।"

পটকা বললে, "ঝাঁকিতে ঘড়ি চলবে, কিন্তু লাইন নড়বে না।"

তার কথা শুনে কয়েকজন একটু হাসলেন।

একজন বললেন, "সত্যি, লোকটা ভারি স্লো।"

দরজার কাছ থেকে এক তরুণ হেঁকে উঠলো, "ও দাদা, তাড়াতাড়ি পেন্‌সিল চালান—বৃষ্টি পড়চে।"

পটকা বললে, "দাদু ইস্কুলে না গিয়ে একদম কলেজে ঢুকেচে। হাতের লেখা অব্যেস করতে হয়নি, তাই পেন্‌সিল চালাতে পারচে না।"

ওরা দু'জনে স্কুলে পড়ে। ওদের বয়সী, ওদের চেয়েও ছোট কয়েকটি স্কুলের ছেলেও রেশন নিতে এসেচে। বাকি সকলে তরুণ, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ। মেয়েদের লাইন আছে ঘরখানার ভেতরে। ভেতরে থেকে বাটখারা ও দাঁড়ি-পাল্লার কর্কশ শব্দ আসচে।

প্যাঁচা বললে, "যে লোকটা চাল দেয় তাকে কি বলে বলতো?"

পটকা বললে, "চালিয়াৎ।"

তাদের কাছের ছেলে-বুড়ো হেসে ওঠে।

হঠাৎ পিছনে তর্কাতর্কি শুরু হলো—"আমি আগে এখানে এসেচি।"

"না, আমি আগে এসে দাঁড়িয়েছিলাম জিগ্যেস করুন ঐ সামনের ভদ্রলোককে।"

"আমি সাক্ষী মানি না, আমি আগে এসেচি—সরবো না।"

"সরতে হবে—এই নন্দা—"

দরজার কাছে যে তরুণটি তাড়াতাড়ি পেন্সিল চালাতে বলেছিল, সে বলে উঠলো, "ও মশায়, বাড়াবাড়ি করবেন না। আমি দেখেচি—ও ওখানে দাঁড়িয়েছিল।"

"তোমায় আর সর্দারি করতে হবে না। যেখানে আছ সেখানেই থাকো।"

"কেন, মারবেন নাকি? তা হলে ভুঁড়ি ফাঁসবে। বুঝলেন?"

ভদ্রলোক আর সইতে পারলেন না, বললেন, "কান টেনে ছিঁড়ে দেবো। তোমার বাবা কখন আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন না। আর তুমি—"

সেই পিছনের ছেলেটা বলে উঠলো, "এখন বাবার দোহাই পাড়া হচ্ছে।"

"শুনচেন মশাইরা, ছেলেটার কথা শুনুন।" বলে ভদ্রলোক কেমন গুম হয়ে গেলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই।

প্যাঁচা চেঁচিয়ে ওঠে, "নড়েচে—নড়েচে—লাইন নড়েচে। আচ্ছা বলো তো চাল কত রকমের?"

পটকা বললে, "দু, রকমের—সিদ্ধ আর আতপ। সিদ্ধর মধ্যে রামশাল, সীতাশাল, বরিশাল, কাশ্মিরীশাল, আসামের শাল, হাতীশাল, ঘোড়াশাল, ঢেঁকীশাল, কামারশাল, টাকশাল, তরাই-এর শাল, আর শোলের মাসতুতো ভাই পুকুরের শাল—"

প্যাঁচা বললে, "ঠিক হয়েচে। আমি বলবো, আরও কত রকমের চাল আছে? শুনে যা—প্রথমেই ধর বোলচাল, বানচাল, ঘোড়ারচাল, বোড়ের

চাল, দাবার চাল, ঘরের চাল, খড়ের চাল, খোলার চাল, টিনের চাল, রাজনীতির চাল, কেন্দ্রের চাল, অন্ধ্রের চাল, পাঞ্জাবের চাল, উড়িষ্যার চাল, থাইল্যাণ্ডের চাল, বর্মার চাল, আমেরিকার চাল,—কত রকমের হ'ল গুণেচিস্?"

পটকা বললে, "হুঁ। পনেরো রকমের।"

প্যাঙা বললে, "আরও আছে। যেমন চালিয়াতের চাল। সকলের সেরা চাল কি বল তো? জানিস্ না? তবে শোন্—যে চালে বাজীমাৎ হয় সেই চাল।"

লাইন নড়েচে—নড়েচে—আর এক হাত।

"ও চালিয়াৎ দাদা। বাটথারার আওয়াজ পাচ্ছি না কেন? এই পটক, তোর সেই কবিতাটা দাদুদের শুনিয়ে দে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ছ'খানা কলাগাছের মত ফুলে উঠেচে, খিদেয় পেট জ্বলচে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে তিরপুরর্ণীর মাঠ। তোর কবিতা শুনে সবাই একটু চাঙা হোক। বল্ বল্—"

পটকা অমনি বললে,—

"শোন ভাই, শোন তবে
ভারতের লোক সবে—
দাও দাও, ফিরে দাও
বাংলারে দিয়ে যাও—
নারিকেল, কেরোসিন,
সরিষার ভরা টিন।
দাও চাল, দাও গম;
নিয়েছ তো হরদম,
প্রতিদিন হেথা হতে
টাকাকড়ি শতে শতে।
বাংলার নুন খাও,
জল খাও, ভাত খাও,
বঙ্গমাতার বুকে
এতদিন আছ সুখে।
আজি তার দুর্দিন,
শোধ ভাই মা'র ঋণ।"

ছেলেরা হাততালি দেয়, বলে, "বাহবা।"

বড়রা বলে, "তা বটে।"

একজন বলেন, "রবি ঠাকুরের লেখা,

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন—

এমনভাবে মিথ্যে হবে কে জানতো? এর জন্যে দায়ী কে? বাঙালী আজ অন্নের কাঙাল—"

প্যাঙা চেঁচিয়ে ওঠে, "আর এক হাত এগিয়েচে—"

পটকা চেঁচিয়ে বলে, "ও দাদা, পেন্‌সিল লেখাতে দিলে ঢিল—"

প্যাঙা চেঁচিয়ে বলে, "পিঠেতে দেবো কিল—"

দরজার কাছ থেকে একটা ছেলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে প্যাঙাকে ইসারা করে, "চুপ-চুপ।"

প্যাঙা বলে, "ক্যান্ রা—?"

সে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

প্যাঙা কাছে যেতেই ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখায়, "ঐ যে—"

প্যাঙা দেখে, তাদের ড্রিল-স্যার।

সে জিভ কেটে সরে এসে পটকাকে বলে, "এই খেয়েচে রে। মেমো লিখচেন ড্রিল-স্যার। নিশ্চয়ই কিল মারার কথা শুনতে পেয়েচেন।"

পটকা বলে, "আজ আবার ড্রিলের ক্লাস। কিন্তু সেই বুড়ো দাদু যিনি ক্যাশমেমো লেখেন তিনি গেলেন কোথায়? খানিক আগেও তো তাঁকে দেখে এসেচি।"

"দাঁড়া, দেখে আসচি।" বলে প্যাঙা ভেতরে ঢুকে যায়, মিনিট কয়েক পরে এসে বলে, "দাদুর ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়েচে। চালের বস্তাগুলোর ওপর শুয়ে পড়েচেন। ড্রিল-স্যার গলি দিয়ে লাইনের দিকে আসবার সময়ে দেখতে পেয়ে থলিগুলো ওখানে রেখে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ক্যাশমেমো লিখতে বসে গেচেন।"

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, "ডাক্তার—ডাক্তার—"

প্যাঙা—পটকা ছুটে ভেতরে যায়। আর কেউ লাইন ছেড়ে নড়ে না, যদি তার জায়গাটা পা ছাড়া হয়ে যায়!

তারা দু'জনেই ছুটে যায় ডাক্তার ডাকতে। আর লাইন নড়ে না; ভেতরে

জীবন-মৃত্যুর পাঞ্জা লড়ালড়ি হচ্ছে। মেয়ে-পুরুষের লাইন ভর্তি জনতা খাদ্য অভাবে অনশন। এমনিতেই গোটা দেশ ক্ষুধায় জ্বলচে! তাদের মধ্যে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ওঠে।

কেউ বলে, "এ রকম লোককে দিয়ে কাজ করানো কেন?" কেউ বলে, "বুড়ো বয়সে খাটবার দরকার কি?"

একজন বলে, "ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটির পাঁচটি নাতি নাতনী। উনি আগে এক ষ্টীমার ঘাটে টিকিট-কালেক্টার ছিলেন; রিটায়ার করেচেন। ছেলেটা বেশি লেখাপড়া শেখেনি। কয়েকবার ব্যবসা করতে গিয়ে ভদ্রলোকের টাকাকড়ি সব নষ্ট করেচে। এখন একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করে। তার আয়ে চলে না। তাই ভদ্রলোককে এখানে চাকরি করতে হয়।"

তবু জনতা শান্ত হয় না, বলে, "এ কথায় তো আমাদের হাঁড়ি চড়বে না। ঘরে একদানা চাল-গম নেই। কালো বাজারে চাল ৩—৫ আর আটা ১—৫। আমাদের ঘরেও ছেলেমেয়ে আছে, যা অবস্থা তাতে ধৈর্য ধরে কথা বলার কোন মানে হয় না।"

যা হোক, ড্রিল-স্যার শেষ পর্যন্ত সকলকেই খুশী করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে বেলা হলো অনেক। প্যাণ্ডা-পটকাও বাদ গেল না। তাদের হয়ে দুটি ছেলে রেশন নিলে, কিন্তু কেউই ড্রিল-স্যারকে সেজন্য ধন্যবাদ দিলে না।

সেদিন দুপুরে স্কুলে তিনি প্যাণ্ডা ও পটকাকে হেড-স্যারের ঘরে ডেকে পাঠাতেই তাদের দু'জনের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। দুটিতে আস্তে আস্তে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি প্যাণ্ডাকে ডাকলেন, "পুণ্যব্রত—"

প্যাণ্ডা ঢোক গিলে বললে, "স্যার, কিল মারার কথাটা—"

ড্রিল-স্যার মুচকি হাসলেন; বললেন, "তুমি কি স্বপন দেখচো—"

"না স্যার। জেগেই আছি।"

"তবে ও সব কি বলচো? জিজ্ঞেস করছি; তুমি তো ভদ্রলোককে ঠিক মতো বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছো? ভালই ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ স্যার। বাড়ি গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।"

প্যাণ্ডার বুকের বোঝা নেমে গেল।

হেড-স্যার বললেন, "বেশ, বেশ। সব সময় লোকের উপকার করবে।"

ড্রিল-স্যার এবার পটকাকে নিয়ে পড়লেন, "প্রশান্তিকুমার, তোমাদের

চালের রকমফেরের কথাটা শুনতে শুনতে রেশনের দোকানের ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। সবটা শুনতে পাইনি। কিন্তু কবিতাটা শুনতে পেয়েছি। কে লিখেছে?"

পটকা মুখ নিচু করে বললে, "আমি।"

হেড-স্যার বললেন, "তুমি কবিতা লিখতে পার? রেশন নিতে গিয়ে কি কবিতা বলেছিলে, বল দেখি।"

পটকা ধীরে সুরু করে বেশ ভাবের সঙ্গে শেষ করলে।

হেড-স্যার বললেন, "বাঃ! আচ্ছা, এক মাস পরে আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হবে। তাতে তোমার লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। কবিতাটির নাম হবে, 'আমাদের স্কুল।' পারবে তো?"

"চেষ্টা করবো।"

কি থেকে কি যেন হয়ে গেল। দু'জনেরই মন হালকা। কিন্তু সারা স্কুলে খবরটা ছড়িয়ে গেল—পুণ্যব্রত আর প্রশান্তিকুমার রেশনের দোকানে অসভ্যতা করার জন্যে হেড-স্যারের কাছে ধমক খেয়েছে। সত্য কথাটা কেউই বিশ্বাস করলো না। এমন কি এক মাস পরে যেদিন পটকা পুরস্কার বিতরণী সভায় দাঁড়িয়ে স্বরচিত দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে তাঁদের সুখ্যাতি লাভ করলো সেদিনও তারা বললে, "ওটা ওর লেখা নয়। যা বললে সেটা কবিতা না ছাই।"

শুনে পটকা বললে, "সত্যরে কহিলে ছাই—
তবু তার ক্ষয় নাই।"

কারণ সে তার শক্তির সন্ধান ও প্রশংসা পেয়েছে যে! আর পরোপকারী প্যাঙা তার বন্ধুর গৌরবে ভারি খুশী। বন্ধুর গৌরবে খুশী হতে পারে কয়জন?